উড়ন্ত চাকী

সিটি বুক এজেন্সী

প্রকাশক ও পরিবেশক

৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
পি, দে
৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯।

মুদ্রাকর :
শ্যামল কুমার গরাই
রামকৃষ্ণ সারদা প্রেস
১২, বিনোদ সাহা লেন,
কলিকাতা-৬।

বাইণ্ডার্স :
সিটি বাইণ্ডার্স
৪৪/১এ, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯।

প্রচ্ছদপট :
মানিক সরকার

উৎসর্গ

নানু ও শানুকে দিলাম—

শুভার্থী

স্বপনবুড়ো

শ্রাবণ, ১৩৫৯।

॥ এক ॥

এক বিশিষ্ট তরুণ বৈজ্ঞানিক নিজের গাড়ী চালিয়ে দ্রুতবেগে দীঘার পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

সারা সপ্তাহ নিজের গবেষণাগারে রাতদিন পরিশ্রম করতে হয়। তাই কয়েকটা দিন দীঘা সমুদ্র তীরে বিশ্রাম করবেন—এই ছিল তরুণ বৈজ্ঞানিকের মনের বাসনা। খুব স্পীডের মুখেই তিনি নিজের গাড়ী চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ আশে-পাশের গ্রামের এক চাষা তার গাড়ীর সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত চমকে উঠে দ্রুত হাতে গাড়ী থামিয়ে দিলেন। আর একটু দেরী হলেই লোকটা গাড়ী চাপা পড়ে যেত। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকেও বিপদে ফেলত।

ভাগ্যি ভালো যে, লোকটা একেবারে গাড়ী চাপা পড়েনি। কিন্তু ভয়ে আর আতঙ্কে সে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

প্রশান্ত তার গাড়ীর সামনে এই কাণ্ড ঘটায় একেবারে বিরক্ত হয়ে গেলেন। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, দুটি কৃষক তারই দিকে চষা ক্ষেত পেরিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে আসছে।

ওদের দু'জনকে দেখে বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত একটু ভরসা পেলেন। কৃষক দুটির সাহায্য নিয়ে বৈজ্ঞানিক লোকটিকে টেনে তুললেন। ওর গাড়ীতে স্মেলিং সল্ট্ ছিল। তাই নিয়ে তিনি অজ্ঞান লোকটির নাকের কাছে ধরলেন। একটু বাদেই লোকটির জ্ঞান ফিরে এলো।

পরে যে দুটি কৃষক ক্ষেতের পথে ছুটে এসেছিল, তারা জানালে, মানুষটি তাদের চেনা। কিন্তু সে এমন করে ছুটে এসে গাড়ীর সামনে পড়ল কেন,—সেকথা ওরা বলতে পারে না।

ইতিমধ্যে লোকটি একটু সুস্থ হয়ে উঠেছে।

চোখ দুটি একবার খুলেই সে অস্ফুট কণ্ঠে কইলে, একটু জ—ল;

বৈজ্ঞানিকের গাড়ীতে খাবার জল ছিল। গেলাসে করে তাই এনে প্রশান্ত লোকটির মুখের কাছে ধরলেন।

এইবার লোকটি জলপান করে।বেশ সুস্থ হয়েছে মনে হল। তারপর ভয়মাখা গলায় আপন মনে কইলে,—

ওরে বাবা, আমি কী দেখলাম!

বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখলে তুমি শুনি?

লোকটির ঠোঁট দুটি থর্ থর করে কেঁপে উঠল। তারপর আপন মনেই কইলে, আচ্ছা, আমি কি ভুল দেখ্‌লাম?

বৈজ্ঞানিক তার মুখের কাছে ঝুঁকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা তুমি কি দেখলে—সেই কথাটাই বল না!

লোকটি উদাস ভাবে একবার ওপরের দিকে তাকাল। তারপর বললে—বাবু, কুমোরদের যেমন চাক হয় সেই রকম একটা বিরাট লাল রঙের চাক আকাশ থেকে লাটিমের মতো ঘুরতে ঘুরতে মাঠের পাশে ঝোপের আড়ালে এসে নামলো। তারপর দৈত্যের মতো দুটি জানোয়ার সেই চাক থেকে বেরিয়ে এলো! কেমন যে তাদের জোব্বা-জাব্বা পোষাক,—আমি তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারবো না বাবু। ওরা জানোয়ার না মানুষ, ভালো করে ঠাহর করতে পারলাম না।

বৈজ্ঞানিক তখন শুধোলেন, ওরা দুটিতে তখন কি করল, সেই কথা আমাকে বল।

সেই লোকটি উত্তরে বললে, আমি ত' একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম বাবু। দেখলাম, জানোয়ার নয়, অসুরের মতো দুটো জাঁদরেল লোক গায়ে তাদের শক্ত পেতলের মতো ঢাল লাগানো। ঝক্ ঝক্ করছে। ওরা টেপা বাতি জ্বালিয়ে চারিদিক দেখতে লাগলো। কি খুঁজছিল ওরা—আমি ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। ওখানে ওই ঝোপের মধ্যে এমন কি সোনা-দানা লুকানো থাকবে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। হঠাৎ দেখি সেই

জোরালো টেপা বাতিটা একটা নারকেল গাছের মাথায় ধরলে। দেখতে দেখতে নারকেল গাছের মাথাটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ডাবগুলো অবধি পুড়ে ভস্মি হয়ে গেল। ওই না দেখে—আমার সারা শরীর থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। আমার দিকে যদি ওই হুবমণরা টেপা বাতিটা উঁচু করে ধরে তা'হলে ত' আমি পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যাবো। আমার বাড়ীতে বৌ-ছেলে-পিলে রয়েছে। তখন তাদের কি দশা হবে? তাদের দেখবার কেউ থাকবে না! যেই একথা আমার মনে হল বাবু, অমনি আমি পাগলের মতো ছুটতে লাগলাম। কখন যে বাবু গাড়ীর সামনে এসে মুখ থুব্ড়ে পড়েছি একেবারে জানতেও পারিনি। বাবু আমার পরাণডা বাঁচিয়ে দিয়েছে।

এতগুলি কথা একসঙ্গে বলে লোকটা হাঁপাতে লাগলো। বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত তখন আর দুটি কৃষকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তা হ্যাগো এই লোকটা যা বলছে—তোমরা দু'জনে কিছু দেখেছ? আমি ত' কিছুই ঠাহর করতে পারছি না।

লোক দুটি তখন মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, না বাবু, ও লোকটা যা বলছে—আমরা ত' তার কিছুই দেখিনি। মানুষটা বোধকরি দিনে দুপুরে খোয়াব দেখেছে।

লোকটা চোখদুটো বড় বড় করে কইলে, দিনে দুপুরে কোথায়? তখন ঠিক সাঁঝ হয়ে আসছে। আকাশে দুটো-একটা করে তারা উঠ্‌ছে ঠিক এমনি সন্ধ্যে বেলা—! এমন সময়েই ত' লাটিমের মতো ঘুরতে ঘুরতে ওই লাল উড়ন্ত চাকীটা এসে ঝোপের ধারে নামল। আমি সাদা চোখে দিব্যি দেখতে পেলাম। তারপর ওদের কাণ্ড-কারখানা দেখে প্রাণভয়ে পাগলের মতো ছুটতে লাগলাম। আমার কি দোষ বল বাবু। এইবার বাড়ী গিয়ে গুড় জল খাবো। প্রাণডা খুব বেঁচে গেছে! আসছে হপ্তায় আমায় সত্যনারায়ণের সিন্নি চড়াতে হবে—

বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত এতক্ষণ অবাক হয়ে ওর কথা শুনছিলেন। এইবার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কইলেন, আচ্ছা, তুমি ত' বললে, একটা উড়ন্ত চাকী এসে ঝোপের ধারে নামল! তুমি আমায় দেখাতে পারবে সেই চাকী?

সেই চাষা মানুষটি শিউরে উঠে কইলে, ওরে বাবা, আর আমি ওদিক পানে যাই? বাপ-ঠাকুর্দার পুণ্যির জোরে বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। এত বড় নারকেলের কাঁদি চোখের সামনে ছাই হয়ে গেল। এত আমার বানানো কথা না। তুমি থাকলে তুমিও প্রাণের ভয়ে পালাতে।

বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত ওকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। —কিন্তু আমাকে ত' ব্যাপারটা বুঝতে হবে। আসল ঘটনাটা না জেনে শুধু শুধু পালালে চল্‌বে কেন?

কিন্তু চাষা মানুষটা কিছুতেই সেখানে ফিরে যেতে রাজী হয় না। তখন বৈজ্ঞানিক বল্‌লেন, আচ্ছা, আজ আমি তোমার বাড়ীতেই থাকবো। তারপর গভীর রাতে উঠে দেখবো,—আসল ব্যাপারটা কী!

চাষা মনিষটা উত্তর দিলে, তা বাবু, আপনি আমার কুঁড়ে ঘরে থাকতে চাও,— সেত' আমার ভাগ্যের কথা। কিন্তু বাবু একটা কথা বলে রাখি, তপ্তভাত কিন্তু তোমায় খাওয়াতে পারব নি। আমাগো সাথে দুটি পান্তাভাত খেতে হবে।

বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত ওর কথা বলার ধরণ শুনে হেসে উঠলেন। বল্‌লেন, আমার খাবার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না ভাই। রাত্তিরে আমি যা' একটু খাবো সে আমার সঙ্গেই আছে। ও জন্যে তোমার কিছু মাত্র চিন্তা নেই।

চাষা ভাই তখন কইলে, বাবু, কেন মিছিমিছি দুষমণদের পাল্লায় পড়ে প্রাণডা খোয়াবে? তার চাইতে তুমি যেখানে যাচ্ছিলে সেইখানে চলে যাও। আমিও ঘরে ফিরে দেখি—আমার ছেলে-মেয়েরা এখনো প্রাণে বেঁচে আছে কিনা।

বৈজ্ঞানিক কিন্তু ততক্ষণে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তিনি উত্তর দিলেন, শোনো ভাই, আমি যখন ঠিক করেছি, আজ রাত্তিরে তোমার বাড়ীতে থাকব,—তখন তুমি আমায় মাথা গোঁজবার ঠাঁই না দিলেও আমি থাকবো। ওই উড়ন্ত চাকীর রহস্যটি দেখতেই হবে।

চাষী বুঝলে, বাবু একেবারে না-ছোড়বান্দা।

তাই বিপদে আকু-পাকু করে কইলে, কিন্তু বাবু, তোমার এই গাড়ী? সেটা কোথায় লুকিয়ে রাখবে? ওই উড়ন্ত চাকীর দুষমণদের হাত থেকে গাড়ীটাকে বাঁচানো শক্ত হবে।

বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর দিলেন, তার জন্যে আর ভাবনা কি? তোমার বাড়ীর উঠোনে ত' গাদামারা খড় আছে। কিছু খড় এই গাড়ীর ওপর চাপিয়ে দিলে আর বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যাবে না। কাজেই দুষমণরা গাড়ী চোখে দেখতেই পাবে না! কিন্তু সেই ফাঁকে আমি দেখে নেবো—উড়ন্ত চাকীটা আসলে কি বস্তু!

চাষীভাই এইবার যেন একটু নিশ্চিন্ত হল। আপন মনে কইলে, বাবু, তোমাদের মগজে কত বুদ্ধি। তোমরা কত লেখাপড়া শিখেছ—আর আমরা হলাম গে গেঁয়ো মুখ্যু। অত বুদ্ধি কি আমরা বের করতে পারি?

বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত তখন তাঁর গাড়ীটা ধীরে ধীরে গাঁয়ের পথে ঢুকিয়ে দিয়ে চাষীভাইয়ের বাড়ীর দিকে রওনা হল।

অন্য দুটি কৃষকও দারুণ কৌতূহলী হয়ে ওদের সঙ্গে রওনা দিল। এই "উড়ন্ত চাক" ব্যাপারটা কি দেখতে হবে। এত যায়গা থাকতে এই পাড়া গাঁয়ের ভেতর মিছিমিছি দুষমণের দল আস্‌বে কেন? তারা নিজেরাই পেটপুরে খেতে পারে না। এই অন্ধকার পাড়াগাঁয়ে কি এমন সোনাদানা লুকিয়ে আছে?

সুতরাং ব্যাপারটা জানবার জন্যে ওদের উৎসাহটাও কম নয়। ধীরে ধীরে অন্য পথে গাছ-গাছালির আড়াল দিয়ে ওরা একটি নিরিবিলি গোবর নিকানো উঠানে এসে হাজির হল।

ওদের সাড়া পেয়ে একদল উদোম ছেলেমেয়ে কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। অবাক হয়ে গাড়ীটাকে সবাই মিলে দেখতে লাগল।

চাষীভাই তখন নিজের বাড়ীটা দেখিয়ে কইলে, বাবু, এই জন্যে তোমায় আমি মানা করেছিলাম। তোমরা বড়লোক। হাওয়া গাড়ী চেপে এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়াও। তোমরা কি আমাদের মতো খড়ের ঘরে থাকতে পারো? তোমাদের কষ্ট হবে যে!

বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত উত্তরে কইলে, সেজন্যে তোমাকে কিচ্ছুটি ভাবতে হবে না। এই গাড়ীর ভেতরই একটা রাত আমি কাটিয়ে দেবো। আমার কোনো অসুবিধে হবে না।

তারপর বৈজ্ঞানিক গাড়ীর ভেতর থেকে এক ঠোঙা লজেন্স আর বিস্কুট ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে বিলিয়ে দিলে।

ওরা এমন মজার জিনিস এই অজ পাড়াগাঁয়ে আর কখনো দেখেনি। তাই লজেন্স আর বিস্কুট হাতে নিয়ে এ-ওর মুখের দিকে বোকার মত তাকিয়ে রইল।

হাতের জিনিসগুলো পেয়ে কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। ওদের বাবা হাসতে হাসতে বললে, ওরে বাবু দিয়েছে, তোরা সব মুখে পুরে দে। দেখবি কত মজা লাগবে খেতে। কুড়মুড় করে ভেঙে ভেঙে খা।

বাপের আশ্বাস পেয়ে ছেলেমেয়েগুলি লজেন্স-বিস্কুট খেতে লাগল।

বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত ইতিমধ্যে তার রাত্রে থাকবার ব্যবস্থা করে নিলেন। গাড়ীর ওপরটায় এমন ভাবে খড় বিছিয়ে দেয়া হল যে, বাইরে থেকে কিম্বা ওপর থেকে কিছুমাত্র বোঝবার যো রইল না যে, ওটা একটা গাড়ী।

চাষীভাই কুণ্ঠিত ভাবে একবার কইলে, বাবু, তুমি আমার ছেলে-মেয়েদের দামী খাবার খাওয়ালে, আর আমি কি তোমাকে পান্তাভাত

খেতে বলতে পারি? আমার বৌ বলছে, তপ্ত ভাত আলু সেদ্ধ দিয়ে চারটি রান্না করে দেবে?

প্রশান্ত ওর পিঠ চাপড়ে জবাব দিলেন, আরে না-না—সেজন্যে তোমায় লজ্জা পেতে হবে না। আমি ত' আগেই বলেছি, আমার সঙ্গে গাড়ীতে রাতের খাবার আছে। রাত্তিরে আমি দু টুকরো পাউরুটি খাবো!

চাষীভাই তখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ওদের কুঁড়ে ঘরে পান্তাভাত খেতে গেল।

বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত তাকে একবার ডেকে বল্লেন দেখ ভাই, আজ রাত্তিরে একটু সজাগ থেকো। যদি সেই উড়ো লাটিমটার আভাস পাও—তা হলে চুপি চুপি আমায় এসে জানিয়ে দিও। হ্যাঁ, দেখো, কোনো সোরগোল করে আবার লোক ডাকাডাকি কোরো না। তা হলে আমার কাজ সব মাটি হয়ে যাবে।

সঙ্গে যে লোক দুটি এসেছিল, তাদের উৎসাহ কিন্তু এতটুকু কমে নি। তারা বললে, আমরা দুই জনে দুটি গাছের ডালে উঠে লুকিয়ে থাকি। দেখি দুষমণ বেটারা সত্যি আসে কিনা!

একটু বাদেই রাত নিশুতি হয়ে গেল। পাড়াগাঁয়ে কেউ রাত্তিরে পিদিম জ্বালায় না—তেলের বড় অভাব। সন্ধ্যার মুখে খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আর জেগে ওঠে সেই ভোর বেলা। তখন ক্ষেতে ক্ষেতে চাষ করতে বেরুতে হবে।

বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে গাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়লেন। বহুক্ষণ রওনা হয়েছেন, সারাদিন ধরে তাঁরও পরিশ্রম কিছু কম হয় নি।

চুপচাপ চোখ বন্ধ করে বৈজ্ঞানিক পড়ে রইলেন। চাষীভাইয়ের গোয়াল ঘর থেকে গাই-গরুদের ফোঁস-ফোঁস শব্দ শোনা যেতে লাগল। দূরে কয়েকটি গ্রামের কুকুরের ভোক্-ভোক্ শব্দ ভেসে আসছিল। এদিক-ওদিক ঝোপে-ঝাড়ে ঝি-ঝি পোকার ডাক।

আস্তে আস্তে বৈজ্ঞানিক ঘুমিয়ে পড়লেন।

কতক্ষণ তিনি এই অবস্থায় ঘুমিয়ে ছিলেন—সে কথা ভালো করে বুঝতে পারলেন না।

হঠাৎ কানের কাছে একটা ফিস্‌ফিসে আওয়াজ শোনা গেল—বাবু! বাবু! উঠে পড় বাবু—

সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের ঘুম ভেঙে গেল।

চাপা গলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে ভাই? কোনো খবর আছে?

বাইরে থেকে উত্তর শোনা গেল—

—হ্যাঁ বাবু, সেই দুষমণরা আবার এসেছে—

—অ্যাঁ আবার এসেছে!

বৈজ্ঞানিক সচেতন হয়ে উঠলেন। তার ঘুমের চটকা চোখ থেকে একেবারে পালিয়ে গেল।

গাড়ীর দরজা খুলে তিনি একেবারে বাইরে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। চারদিকে জ্যোৎস্নার যেন ঢল নেমেছে।

চোখটা ভালো করে কচলে নিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি করে বলছ? ওরা আবার এসেছে?

—বাবু, আমি কি আপনার সঙ্গে মস্করা করতে পারি? ইতি-মধ্যে সেই গাছের ডালে বসা দুটি লোকও নীচে নেমে এসেছে। তারাও চুপিচুপি কইলে আমরাও দেখেছি বাবু। ডালের ওপর বসে একটুখানি ঘুমের আমেজ এসেছিল। হঠাৎ শুনি ভোম্‌রার গুণ-গুণানি। এক লহমায় ঘুম চোখ থেকে পালিয়ে গেল।

তাকিয়ে দেখি—একটা লাল লাট্টিম—আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছে।—ওই দেখুনবাবু, ওরা দূরে চলে গিয়েছিল—আবার গুণ গুণ করতে করতে ফিরে আসছে।

বৈজ্ঞানিকের গাড়ীতে একটা দূরবীণ ছিল। দীঘার সমুদ্রের দৃশ্য দেখবেন বলে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ীর ভেতর থেকে দূরবীণটা টেনে বের করলেন।—হ্যাঁ, লাল রঙের চাকীর মতো একটা লাটিম যেন সারা আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় নাম্‌বে যেন ঠিক করতে পারছে না।

ইতিপূর্বে এই উড়ন্ত চাকী সম্পর্কে কিছু কিছু লেখা এই তরুণ বৈজ্ঞনিক পড়েছেন। কিন্তু চোখের সামনে এমন দৃশ্য দেখতে পারবেন —এমন কথা বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত ইতিপূর্বে আর ভাবেন নি।

গভীর মনযোগের সঙ্গে তরুণ বৈজ্ঞানিক দূরবীণের ভেতর দিয়ে উড়ন্ত চাকীর আনাগোনা লক্ষ্য করতে লাগলেন।

আকাশে আজ জ্যোছনার জোয়ার জেগেছে। তাই তাঁর দেখবার পক্ষে কোন অসুবিধাই হচ্ছিল না।

রাত্রের আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ নেই।

তাই উড়ন্ত চাকীর আনাগোনা-ভালো ভাবেই বৈজ্ঞানিকের চোখে ধরা পড়ল।

বৈজ্ঞানিক আপন মনে ভাবতে লাগলেন—

পৃথিবীতে এত যায়গা থাতে এই উড়ন্ত চাকী এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসে হাজির হয়েছে কেন?

এর একমাত্র উত্তর এই হতে পারে যে দীঘার সমুদ্রতীর এখান থেকে খুব কাছে। সেখানে আধুনিক যন্ত্রপাতি সাজানো একটা সুন্দর মান-মন্দির সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে।

তারই খোঁজে কি মঙ্গলবাসীর পক্ষ থেকে এই অভিনব উড়ন্ত চাকী পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে?

বৈজ্ঞানিক ভেবে ভেবে কোনো কূল কিনারা খুঁজে পান না। কিন্তু ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করতেই হবে।

এতবড় সুযোগ যখন চোখের সামনে এসে হাজির হয়েছে—তখন তার সংব্যবহার করতেই হবে।

নইলে বৈজ্ঞানিক হিসেবে তিনি নিজের কাছে কী জবাবদিহি করবেন?

॥ দুই ॥

রাস্তা জানা না থাকা সত্ত্বেও তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে—মাঠের দিকে এগিয়ে চললেন।

মনে হল—উড়ন্ত চাকীটা ওইখানেই নামবে।

উড়ন্ত চাকীটা কিন্তু একই ভাবে আকাশের বুকে চক্কর দিচ্ছিল। আরো খানিকটা বাদে ঠিক ছেলেদের লাটিমের মতো চাকীটা মাঠের মাঝখানে নেমে এলো।

লাল রঙের হেলমেট্, আর সারা দেহ লাল বর্মে আবৃত ছুটি জীবন্ত লোক—সেই উড়ন্ত চাকীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো।

চাঁদের স্নিগ্ধ আলো পড়ে ওদের পোষাকগুলি ঝক্‌মক্ করছিল। তরুণ বৈজ্ঞানিক একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখলেন ওদের মুখের কাছে গণেশের শুড়ের মত কি যেন ঝুলছে।

ওদের জীবনী শক্তির জন্যে হয়ত এমন কোনো গ্যাসের প্রয়োজন যার অস্তিত্ব আমাদের এই পৃথিবীতে নেই! সেই জন্যে ওই গ্যাস মুখোশের প্রয়োজন।

তরুণ বৈজ্ঞানিক দূরবীণ দিয়ে ভালো করে দেখলেন, ওদের অদ্ভুত পা যেন পৃথিবীর বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। আমরা যাকে হাঁটা বলি অন্য গ্রহের অধিবাসীরা ঠিক সে ভাবে চলছে না।

কিন্তু তরুণ বৈজ্ঞানিক অনেক ভেবে চিন্তে বিস্তর মাথা ঘামিয়ে এ কথা বুঝতে পারছিলেন না যে, এই পল্লীগ্রামে কেন শুধু শুধু উড়ন্ত চাকীর আনাগোনা। এখানে এমন কি বৈজ্ঞানিক বস্তু লুকিয়ে আছে—যার সন্ধানে গ্রহান্তরের মানুষ উড়ন্ত চাকীতে চেপে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরবর্তী পৃথিবীর একটি পাড়াগাঁয়ে চলে এসেছে। তরুণ

বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত দূরবীণের ভেতর দিয়ে ওদের কার্যকলাপ মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ বাদে একটা স্নিগ্ধ নীল আলো সেই উড়ন্ত চাকীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। চারদিকে যেন সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

তবে কি ওরা তরুণ বৈজ্ঞানিকের অস্তিত্বের কথা বুঝতে পেরেছে? তাই নীল আলো ফেলে তার অনুসন্ধান করছে?

হঠাৎ ওই স্নিগ্ধ নীল আলো এসে তার মস্তিষ্কের দ্বারে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের মনে হল—সেই নীল আলো তার মনের কথা যেন জানতে চাইছে।

কিন্তু কেউ কারো ভাষা জানে না। তাই মনের পরশ পেলেও তার জিজ্ঞাসার কোনো জবাব তরুণ বৈজ্ঞানিক দিতে পারলেন না।

এ যেন মনের নিভৃত কোণে একটা সুড়সুড়ি অনুভব করা গেল। কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ন মস্তিষ্ক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না।

কোন্ সুদূরের শূন্য থেকে যেন এক আহ্বান আসছে।

সেই ডাকে কিন্তু তরুণ বৈজ্ঞানিক সাড়া দিতে পারছেন না।

এই রকম অস্বোয়াস্তি তিনি এর আগে কখনো অনুভব করেন নি।

গ্রহান্তরের অধিবাসী সেই নীল আলো ফেলে আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করে গেল। কিন্তু যেন মনে হল—তাদের মনের কথা ওরা পৃথিবীর মানুষকে বোঝাতে পারলে না।

আরও খানিকক্ষণ বাদে সেই নীল আলো গুটিয়ে ওরা সেই উড়ন্ত চাকী নিয়ে জ্যোছনা ধোয়া আকাশের বুকে উধাও হয়ে গেল।

তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত এই ব্যাপার দেখে একেবারে হতাশ হয়ে গেলেন।

এতদিন উড়ন্ত চাকীর কথা তিনি শুনে আসছেন, কোনো কোনো বৈজ্ঞানিকের রচনায় তা পাঠও করেছেন। সংবাদ পত্রে মাঝে মাঝে সে খবর পড়েছেন।

আজ যখন সামানা-সামনি উড়ন্ত চাকী দেখা গেল,—বৈজ্ঞানিক হয়েও তিনি গ্রহান্তরের অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলেন না, তাঁর জীবনে এটা একটা পরম সুযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়া বলে মনে করলেন। তিনি ত পৃথিবীর সাধারণ মানুষ কিংবা চাষা নন, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তিনি নিযুক্ত আছেন। বিজ্ঞান জগতে নতুন কিছু আবিষ্কার করে তিনি বৈজ্ঞানিক হিসেবে অমর হয়ে থাকবেন এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাও তাঁর মনে আছে।

কিছুদিন হল তিনি ভারতের কয়েকটি মান-মন্দিরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে গ্রহান্তর সম্পর্কে গবেষণা করবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কিছুতেই সাফল্য লাভ করতে পারছিলেন না।

হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো একটা কথা তার মনে উদিত হল। তিনি কিছুকাল যাবৎ গ্রহান্তরে যে সব খবর পাঠাবার চেষ্টা করছিলেন, কিছুতেই তিনি এ ব্যাপারে পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আচ্ছা, এটাও ত' হতে পারে যে, গ্রহান্তরের অধিবাসী কোনো রকমে তাঁর সন্ধান পেয়ে—তারই পেছনে ধাওয়া করেছিল—এই উড়ন্ত চাকী নিয়ে? কিন্তু ভাষা জানা না থাকায়—তারা পরস্পরের মনের কথার আদান-প্রদান করতে পারলেন না।

যে উড়ন্ত চাকীটা তাকে অনুসরণ করে এসেছিল—মনে হয় তারা মঙ্গল গ্রহের অধিবাসীকে নিয়েই দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েছে।

তাদের উভয়ের উদ্দেশ্য এক। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে মনের ভাব-বিনিময়। কিন্তু এত কাছাকাছি এসেও ওদের উদ্দেশ্য সফল হল না।

তরুণ বৈজ্ঞানিক মনে মনে ভাবছিলেন—তাকে এবার অন্য পথে অগ্রসর হতে হবে।

যে তিনজন কৃষক তরুণ বৈজ্ঞানিকের অনুসরণ করে এসেছিল, তারা একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে এই বাবুটির ক্রীড়াকাণ্ড লক্ষ্য করছিল। ওদের ধারণা হয়েছিল,—যে নীল আলোটা বাবুর

মাথার ওপর এসে পড়ল তাতেই বাবু একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

এই কথা ভেবেই—তারা আর এগুতে সাহস পাচ্ছিল না।

কিন্তু যখন তারা দেখল, বাবুটি জ্যান্তই আছে,—তখন তাদের সাহস বেড়ে গেল। তারা এক পা– ছু-পা করে এগিয়ে এলো।

একজন কৃষক জিজ্ঞেস করল, বাবু তা হলে তুমি বেঁচে আছ? আমরা ভেবেছিলাম—ছুষমণদের ওই নীল আলোতে তুমি পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছ—

তরুণ বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন না-রে, ওরা আমাকে পুড়িয়ে ছাই করতে চায় নি। ওরা আমাকে কি কথা যেন জিজ্ঞেস করছিল। কিন্তু আমি ওদের কথা কিছু বুঝতে পারলাম না। তাই ওদের কথারও কোনো জবাব দিতে পারলাম না।

কৃষক তিনজন বাবুর কথা শুনে একেবারে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল। ছুষমণরা বাবুকে তাহলে কি কথা জিজ্ঞেস করছিল?

আর একজন চাষী জিজ্ঞেস করল, বাবু, আমাদের ত' তা হলে খুব বিপদ হল। এই ছুষমণদের দল যখন-তখন এসে হাজির হবে। ওদের সঙ্গে রয়েছে ছু'রকমের আলো। লাল আলো জ্বললে—সব কিছু পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। আর যদি নীল আলো জ্বলে—তাহলে ওরা কি কথা যেন জিজ্ঞেস করে। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ ছুষমণদের কথা জানবে কি করে? তখন যদি ওরা রাগ করে আবার লাল আলো জ্বালিয়ে দেয়—তা হলে আমাদের গ্রামকে গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তখন আমাদের কে রক্ষা করবে? ছুষমণ ব্যাটারা কি আর কোনো অঞ্চল খুঁজে পেলো না? এই আমাদের নিরিবিলি গাঁয়ে মরতে এসেছে?

তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্তর মনে তখন অন্য কথার আনাগোনা চলছে। একবার মনে হল—দীঘায় গিয়ে কি কয়েকদিন কাটিয়ে আসব? পর মুহূর্তেই তিনি ভাবলেন, কাজ নেই দীঘায় গিয়ে কয়েকদিন

নষ্ট করার জন্য। তার চাইতে সোজা তাঁর কর্মস্থলে গিয়ে নিজের বিজ্ঞানাগারে চেষ্টা করা যাক। যদি এই উড়ন্ত চাকীর প্রেরকদের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।

তরুণ বৈজ্ঞানিকের মনের ধারণা—মঙ্গল গ্রহ থেকেই এই উড়ন্ত চাকী পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছিল।

তরুণ বৈজ্ঞানিক আরো চিন্তা করলেন যে, তিনি যেমন মঙ্গল গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে একান্ত উৎসুক, ঠিক তেমনি মঙ্গল গ্রহের কোনো বৈজ্ঞানিক হয়ত' এই পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করছে।

এই উভয়ের চেষ্টাকে একই পথে পরিচালিত করতে হবে। অবশেষে একদিন সেই পথ সহজ রাস্তায় এসে মিলিত হবে। তখন আর গ্রহান্তরবাসী বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করতে কোন অসুবিধা হবে না।

যতদিন সেই যোগাযোগ স্থাপিত না হয়—সে পর্যন্ত তাঁকে প্রাণ-পণে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বৈজ্ঞানিকেরহতাশ হয়ে বসে থাকলে চলবে না। বৈজ্ঞানিকের জীবনই হচ্ছে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া। আশার পরেই নিরাশা এবং সামান্য সাফল্যের পরেই পর্বত প্রমাণ বাধা এসে সম্মুখে দাঁড়াবে। কিন্তু কিছুতেই বিচলিত হলে চল্‌বে না।

তাই মনস্থির করে তরুণ বৈজ্ঞানিক তার গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। কৃষক তিনজন তার সঙ্গে সঙ্গে আসছিল।

একজন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, বাবু, আপনি কি এই রাতেই ফিরে যাবেন?

অপরজন প্রশ্ন করল, বাবু, এই নিশুতি রাতে আপনাকে একা একা ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। পথে যদি আপনার কোন বিপদ-আপদ হয়?

যে চাষীভাইয়ের বাড়ী বৈজ্ঞানিক রাত্রে আশ্রয় গ্রহণ

করেছিলেন, সে এইবার এগিয়ে এসে সঙ্কোচের সঙ্গে কইলে, বাবু, আপনি আমার বাড়ী একটা রাত কোনো রকমে কাটিয়ে গেলেন। আপনাকে কিছু খাওয়াতে পারলাম না। এতে আমার ছেলেমেয়ের বড় অকল্যাণ হবে। সকাল হোক,—আপনি আমার গাইয়ের দুধ আর মুড়ি, কলা, গুড় খেয়ে রওনা হবেন। তাহলে আমার মনটা শান্তি লাভ করবে। আপনি রাজি হয়ে যান বাবু। ভোর হবার আর খুব বেশী বিলম্ব নেই।

তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত খানিকক্ষণ আপন মনে কি ভাবলেন। এই আপন ভোলা, উদার চাষীভাইয়ের মনে ব্যথা দিতে ওর মন চাইলে না। তাই তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

বাবু তাদের কথা শুনে রাত্তিরের অন্ধকারেই চলে যাবেন না জেনে কৃষক তিনজন ভারি খুশী হল।

তখন বৈজ্ঞানিককে সঙ্গে নিয়ে তিনজন আবার সেই চাষীর বাড়ীতে ফিরে এলো।

রজনীর শেষ প্রহর তখনো শেষ হয় নি।

চারমূর্তি নীরবে—এসে মাটির দাওয়াতে বসল।

কৃষকেরা আপন মনে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছিল।

একজন বললে, আজ সারাটা রাত আমাদের এক রকম জেগেই কাটল। আমার ত' ঝিম লাগায় গাছের ডাল থেকে পড়েই যাচ্ছিলাম। কোন রকমে একটা ডাল ধরে ফেলে মাটিতে পড়ার হাত থেকে বাঁচি।

আর এক চাষীভাই হাই তুলে কইলে, বেশ করে তামাক সাজো ভাই। বাবুকে তামাক টানতে দাও। আমরাও শেষ রাত্তিরে একটু সুখ টান দি।

বৈজ্ঞানিক তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, না—না, তোমরা তামাক সেজে আমেজ করে টানো। আমার পকেটে সিগারেট আছে, আমি তাই টানছি।

চাষীভাইরা দাওয়াতে রাখা তামাক বের করে নিয়ে সাজতে বসল।

আর ক্লান্ত আর উদ্বিগ্ন বৈজ্ঞানিক পকেট থেকে সিগারেট বের করে আপন মনে টানতে লাগলেন।

কারো মুখে কোনো কথা নেই।

সবাই আপন মনে নানা কথা ভাবতে লাগল।

রজনীর এই শেষ প্রহরটা প্রায়ই মানুষের দেখা হয় না। কারণ এই সময়টায় লোকে গাঢ় ঘুমে মগ্ন থাকে।

তরুণ বৈজ্ঞানিক উদাস ভাবে একবার বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকালেন।

আকাশের জ্যোছনা কখন মিলিয়ে গেছে।

গাছে গাছে ভোরের পাখীর অস্ফুট কাকলী শোনা যাচ্ছে।

প্রশান্তের ঠাকুমা তার ছেলেবেলায় প্রায়ই শোনাতেন—

"ডাকে পাখি—না ছাড়ে বাসা, খনায় বলে সেই ত উষা।" এই উষা কালে উঠে ঠাকুমা শিবের স্তোত্র পাঠ করতে করতে গঙ্গা স্নানে যেতেন!

শৈশব কালটা ভারি মধুর।

অকারণ দুশ্চিন্তা মনকে ভারাক্রান্ত করেনা।

অতি ক্ষুদ্র আনন্দেই মন উল্লাসিত হয়ে ওঠে।

অতি সামান্য একটি খেলনা পেয়ে মনে হয়—একটা রাজ্য লাভ হয়েছে। আজকের রাতটা প্রশান্তের জীবনে একটি নতুন অভিজ্ঞতা এনে দিল। যাচ্ছিল—অবসর যাপনের জন্যে দীঘার সমুদ্র তীরে?

কিন্তু মাঝ পথে তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা লাভ। উড়ন্ত চাকীর কথার সে বহুদিন ধরেই শুনে আসছে। বিভিন্ন সময়ে সংবাদ পত্রেও উড়ন্ত চাকীর কথা মাঝে মাঝে পড়া গেছে। কিন্তু একেবারে চোখের সামনে উড়ন্ত চাকী কখনো এসে দেখা দেয়নি।

তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্তের মনে হল—এই উড়ন্ত চাকী সম্পর্কে ভবিষ্যতে তাকে গবেষণা করতে হবে বলেই বোধ করি এই বস্তুটি আকস্মিক ভাবে তার সামনে হাজির হয়েছে।

এই ব্যাপারে তাঁর জীবন-দেবতার কি কোনো ইঙ্গিত আছে? আপন মনে প্রশান্ত বসে ভাবতে থাকে।

আর খানিকবাদেই উষার আলো সারা আকাশময় ছড়িয়ে গেল। ভোরের পাখীর দল যেন অন্ধকারের খাঁচা থেকে মুক্তি লাভ করে অসীম শূন্যে ছড়িয়ে পড়ল।

বৈজ্ঞানিক আপন মনে বসে ভাবতে থাকেন। এই পাখীর দলও ত' এক পক্ষে উড়ন্ত চাকী।

কিন্তু বিধাতা তাদের ওড়বার একটা সীমানা নির্দেশ করে দিয়েছেন। সেই গণ্ডীর বাইরে ওদের উড়ে যাবার ক্ষমতা নেই।

কিন্তু গ্রহান্তরের অধিবাসীরা তাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বলে সৃষ্টি করেছে এই উড়ন্ত চাকী। মহাশূন্যের যে কোনো অঞ্চলে এরা অবলীলা ক্রমে উড়ে চল্‌ছে।

মহাশূন্যের আবহাওয়াকে এরা সচ্ছন্দে অতিক্রম করেছে! মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ওরা অবলীলা ক্রমে পরাভূত করে পাখীর চাইতেও সহজ গতিতে এরা সর্বত্র এগিয়ে চলেছে।

মানুষ কি বিজ্ঞান চর্চায় এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে? তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত আপন মনে ভাবতে থাকেন।

একটু বাদেই একেবারে সকাল হয়ে গেল।

চাষী বৌ ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

সারা উঠোনে গোবর জলের ছড়া দেয়া গেরস্ত বৌয়ের প্রথম কাজ। ছেলেমেয়ের দল এরই মধ্যে গিয়ে গোয়ালঘর থেকে গাই বাছুরগুলো বের করে নিয়ে এলো।

চাষী নিজে গিয়ে ভালো করে পাত্র ধুয়ে গাই দুইয়ে নিয়ে এলো। এ দুধের মধ্যে কিন্তু একেবারে জল মেশানো হল না।

চাষী তখন চাষী বৌয়ের কাছে গিয়ে চুপি চুপি কি যেন বললে। চাষী বৌ ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানালো।

তারপর দুধের হাঁড়ি নিয়ে রান্না ঘরে জ্বাল দিতে চলে গেল। ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যে পাশের ডোবা থেকে মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিয়ে গামছায় ভালো করে হাত মুছে—একটা টিনে হাত ডুবিয়ে এক বাটি করে মুড়ি তুলে আনলে' তাতে এক খাব্‌লা করে গুড় দিয়ে মচ্‌ মচ্‌ করে খেতে সুরু করে দিলে!

করিৎকর্মা চাষী বৌ দুধ জ্বাল দিয়ে—বেশ খানিকটা সরু চিড়ে জলে ধুয়ে গরম দুধের মধ্যে ছেড়ে দিলে। তার ভেতর দিলে দুটি পাকা কলা আর খানিকটা খেজুড়ে গুড়।

তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত এতক্ষণ ধরে দাওয়ায় বসে আপন মনে ভাব্‌ছিলেন—ওদের দুই দলের চিন্তাধারা, কত পৃথক।

কৃষক দল ভাবছে, এখন গরু আর লাঙ্গল নিয়ে মাঠে ছুটতে হবে। সারাদিন ধরে রদ্দুরের মধ্যে মাঠ চষতে হবে। দুপুরে হয়ত চাষীবৌ এক থালা ভাত গামছায় ঢেকে—সেই রদ্দুরে পোড়া মাঠে গিয়ে হাজির হবে।

এদিকে তরুণ বৈজ্ঞানিক ভাবছেন, কতক্ষণে এদের আতিথ্য থেকে মুক্তি পেয়ে গাড়ী চালিয়ে নিজের ডেরায় গিয়ে হাজির হবেন।

সারারাত জেগে মাথা উত্তপ্ত হয়ে আছে।

বেলা করে ঠাণ্ডা জলে স্নান সমাপন করতে হবে। তারপর নিজের কর্মকেন্দ্র ল্যাবরেটরীতে ঢুকে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাববে—নিজের চোখে দেখা "উড়ন্ত চাকী" সম্পর্কে কি ঠিক করা যায়।

একবার তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত ভাবলেন, তার এই অভিনব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে খবরের কাগজে একটা বিবৃতি দেবেন কিনা—

[তিন]

তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্তর ল্যাবরেটরীতে বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক বিদেশী ম্যাগাজিন আছে। এই সব পত্র-পত্রিকায় যে সব উল্লেখযোগ্য ও চমকপ্রদ খবর প্রকাশিত হয়—তরুণ বৈজ্ঞানিক সেই সব সংবাদ কেটে নিয়ে একটি ফাইলে যত্নের সঙ্গে আটক রাখেন।

একটি আলাদা ফাইল আছে "উড়ন্ত চাকী"।

প্রশান্ত ভালো ভাবে স্নান করে এক কাপ চা খেয়ে সেই ফাইলটি নিয়ে বসেন। তার মুখের সিগারেট ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাতে লাগল।

উড়ন্ত চাকী সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোন্ কোন্ দেশের কাগজে খবর ছাপা হয়েছে—তাই খুটিয়ে দেখাই বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্য।

স্পেনের সমুদ্র তীরে, আর্জেনটিনায়, কামস্কাটকায়, আফ্রিকার ঘন জঙ্গলের ধারে এই উড়ন্ত চাকী ইতিপূর্বে গ্রামের লোকদের আর জেলেদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

প্রথমটায় এদের কথায় কেউ আস্থা স্থাপন করেননি। তারপর এক জাহাজের ক্যাপ্টেন উড়ন্ত চাকী দেখেছেন বলে যখন কাগজে বিবৃতি দিলেন, তখন বৈজ্ঞানিকদের টনক নড়ল।

তাহলে এই "উড়ন্ত চাকী" বস্তুটি আসলে কী? বহু মানমন্দির থেকে শক্তিশালী দূরবীণ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চল্‌তে লাগল।

একবার একটি উড়ন্ত চাকীর সঙ্গে একটি ঈগলের সংঘর্ষ হয়েছিল। ঈগলটি টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে নাকি মাটিতে পড়ে যায়। কিন্তু সেই উড়ন্ত চাকীর গতিপথ এতটুকু পরিবর্তিত হয় নি।

এই দুর্ধর্ষ আকাশ-যান কাউকে দেখে এতটুকু ভয় পায় না।

তার শূন্যের গতিপথ একবারের জন্যে রুদ্ধ করতে পারে এমন শক্তিশালী আকাশযান নাকি পৃথিবীর বুকে তৈরী হয়নি।

তরুণ বৈজ্ঞানিক চিন্তা করতে লাগলেন, এই উড়ন্ত চাকী কোন্ গ্রহ থেকে পৃথিবীর আকাশে উড়ে এসেছে,—সেটা চিন্তা করা একান্ত ভাবে আবশ্যক।

যে গ্রহ থেকেই উড়ন্ত চাকী উড়ে আসুক—পৃথিবী সম্পর্কে তার সম্যক জ্ঞান আছে এ কথা সহজ ভাবেই ভেবে নিতে হবে।

আর যে গ্রহ থেকে এই উড়ন্ত চাকী উড়ে এসেছে—বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সেই গ্রহবাসী যে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে—সে কথা অতি স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করা যেতে পারে।

তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেই ফাইল তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে দেখতে লাগলেন।

পরবর্তী কাটিংগুলিতে আরো খবর পাওয়া গেল।

দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্র উপকূলে—একটি নারকেল বাগানের ধারে কয়েকটি শ্রমিক ডাবের কাঁদি বেঁধে বেঁধে আঁটি করে রাখছিল।

সবে সেই সময় সূর্যাস্ত হয়েছে।

আকাশে-সাগরে একেবারে রঙে মাখামাখি।

শ্রমিকদল সেই সমুদ্র উপকূলে নারকেল বাগানের ধারে বসে আপন মনে কাজ করে চলেছে।

দিনের শেষ হয়ে এসেছে। এইবার তারা কাজ থেকে ছুটি পাবে। বাড়ীর পথে পা চালাতে পারবে—সেই আনন্দেই তারা উৎফুল্ল।

হঠাৎ একটি শ্রমিক পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে—প্রকাণ্ড বড় লাল লাটুর মতো গোলাকার একটি চাক্তি দ্রুতবেগে আকাশের ওপর দিয়ে উড়ে আসছে।

প্রথমে শ্রমিকটি মনে করল, ওটা বুঝি একটা নতুন ধরণের উড়ো জাহাজ— ওটা ওদের অঞ্চলের দিকেই উড়ে আসছে।

আরো খানিকক্ষণ বাদে আকাশের দিকে চাইতেই ওর মনে একটা চমক্ লাগল।

না-না এটা ত' উড়োজাহাজ নয়

নিশ্চয়ই নতুন কিছু ব্যাপার।

তখন সে তার সঙ্গী সাথীদের এই উড়ন্ত চাকীটাকে দেখিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা ভাই, এ জানোয়ারটা কি—আকাশ দিয়ে উড়ে আসছে?

তখন সবাইকার দৃষ্টি আকাশের দিকে গেল। লাল টক্‌টকে উড়ন্ত চাকীটা ছেলেদের খেলার লাটুর মতো। ঝন্‌ঝন্ শব্দে এগিয়ে আসছে।

ওরা সবাই হাতের কাজ ফেলে—বড় বড় চোখ করে উঠে দাঁড়াল।

তাই ত' এটা কোনো উড়োজাহাজ,—না, আজব কোনো বিদেশী জানোয়ার?

সবাই মিলে দারুণ কৌতূহল নিয়ে সমুদ্র তীরের দিকে ছুটতে লাগল।

ততক্ষণে সেই উড়ন্ত চাকীটা চক্কর খেয়ে সমুদ্রের ধারে নেমে পড়েছে।

শ্রমিকের দল এই তাজ্জব ব্যাপার দেখে রাস্তার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়েছে!

ইতিমধ্যে আরো অবাক কাণ্ড।

সেই উড়ন্ত চাকীর ভেতর থেকে আজব ধরণের পোষাক-পরা ছুটি জ্যান্ত জানোয়ার মাটির বুকে নেমে পড়েছে।

শ্রমিকদল পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করতে লাগল।

এই আজব জানোয়ারের ভালোভাবে সন্ধান নিতে এগিয়ে যাবে —না, পলায়ন করবে ওদের নারকেল বাগানের দিকে?

ওদের মধ্যে কয়েকটি মানুষ ছিল—ভারি সাহসী।

তারা বললে- আরে ভাই, এত ভয় পাবার কি আছে? চলো না—এগিয়ে গিয়ে দেখি—ওরা কি তাজ্জব জানোয়ার—

তখন সবাই মিলে দল বেঁধে এগিয়ে চলে—

সেই আজব পোষাক পরা লোক গুলোর মুখে হাতির শুঁড়ের মতো কি যেন দুলছে!

এতগুলো মানুষকে একসঙ্গে এগুতে দেখে ওরাও একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

তারপর সেই আজব জানোয়ারগুলো ইসারা করে ওদের চলে যেতে বলল।

শ্রমিকদল তখন বেশ সাহস পেয়ে গেছে। তাদের ইঙ্গিতে পেছু না হটে—ওরা আরো খানিকটা এগিয়ে গেল।

তখনি ঘটল সাংঘাতিক ঘটনা।

সেই উড়ন্ত চাকীর দুরন্ত পোষাক-পরা লোক দুটি—হঠাৎ হাত উঁচু করে দুটো কাঠির মতো কি যেন সামনে এগিয়ে ধরলে।

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ঝকঝকে কাঠি দুটোর ভেতর থেকে আগুনের হল্‌কা বেরিয়ে সেই শ্রমিকদলকে একেবারে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে।

ওরা যেমন দাঁড়িয়েছিল— ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তাদের সারা দেহগুলো আগুনে পোড়া গাছের মতো ঠায়খাড়া রইল। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে নারকেল বাগানের আরো একদল মানুষ ছুটে বেরিয়ে এলো। কিন্তু ততক্ষণে উড়ন্ত চাকী আকাশ পথে পালিয়ে গেল।

এই ঘটনাটা সত্যি চাঞ্চল্যকর।

খবরটি যথাসময়ে বহু বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকা এবং দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

আর এই নিয়ে বৈজ্ঞানিকমহলে চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন ঘটে থাকে,—ঠিক সেই রকম ধীরে

ধীরে এই উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তারপর সেই অঞ্চলে উড়ন্ত চাকী নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি।

তরুণ বৈজ্ঞানিকের এই ফাইলের বহু কাটিং দেখে এটা অনুমান করা শক্ত নয় যে, উড়ন্ত চাকী পৃথিবীর বহু অঞ্চলে নানা ধরণের মানুষ দেখেছে। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে এই আকাশ পথের যন্ত্রটি উধাও হয়ে গেছে বলে—এ সম্পর্কে কেউ প্রকৃত ঘটনা বুঝতে কিম্বা অপরকে জানাতে পারে নি।

কিন্তু সংবাদপত্রে অন্য দশজন পাঠকের মতো সাধারণ একটা খবর পড়া এক কথা,—আর সেই ঘটনা চোখের সামনে ঘটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। একেই বলে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

অন্য বহুবিধ সংবাদের সঙ্গে আমরা যদি একটি বাড়ীতে ডাকাতির কথা পড়ি—তবে অতি সহজেই আমরা পাতা উল্‌টে যেতে পারি। কিন্তু সেই ডাকাতি যখন নিজের বাড়ীতে ঘটে, তখন অতি স্বাভাবিক ভাবেই আমরা বিহ্বল আর দিশেহারা হয়ে পড়ি। ডাকাতির গল্প কে না জানে, কে না খবরের কাগজে পড়ে! কিন্তু সেই ডাকাতি যখন নিজের স্কন্ধে এসে চেপে বসে—তখন সমস্ত শরীর থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে থাকে। মানুষ সহজেই একেবারে ভীত-চকিত হয়ে পড়ে।

আজ তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত যে উড়ন্ত চাকী নিজের চোখে দেখেছেন সে কথা তিনি আদৌ ভুলতে পারছেন না। প্রশান্ত বৈজ্ঞানিক বলে ব্যাপারটার গুরুত্ব আরো বেশী উপলব্ধী করতে পেরেছেন।

এখন তাঁর একমাত্র চিন্তা হল,...কি করে ভিন্ন গ্রহের এই উড়ন্ত চাকীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।

প্রশান্ত তাঁর সংগ্রহ করা আরো নানা জাতীয় বিদেশী ম্যাগাজিন ইত্যাদি খুঁজতে সুরু করে দিলেন।

অনুসন্ধান করতে করতে বেলা বেড়ে গেল।

চাকর এসে খবর দিলে, বাবু, অনেক বেলা হয়ে গেছে। আপনার কি খিদে তেষ্টাও নেই।

প্রশান্ত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সত্যি অনেক বেলা হয়ে গেছে। খিদেও বেশ পেয়েছে। কিন্তু সে দিকে তার দৃষ্টি ছিল না বলে খিদের কথাটা মনে আদৌ জাগে নি।

এখন বিশ্বস্ত ভৃত্য শম্ভুদা স্মরণ করিয়ে দিতে উদরের ভেতরকার আগুন যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

সাধারণত এই রকমই হয়ে থাকে।

যার পায়ে একটা ব্যথা হয়েছে—সে সেই ব্যথা নিয়েই কাবু হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু তার ওপর যদি আরো একটা দারুণ মাথা ব্যথা সুরু হয়ে যায় —তখন মানুষ আগেকার পায়ের ছোট্ট ব্যথাটার কথা বেমালুম ভুলে যায়। মাথার যন্ত্রণাটাই তখন তীব্র হয়ে ওঠে।

এতক্ষণ উড়ন্ত চাকীর ভাবনা বৈজ্ঞানিকের মনটিকে আচ্ছন্ন করে-রেখেছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে ভৃত্য শম্ভুদা এসে জানালে—খাবারের সময় হয়েছে,—ঠিক তখনই প্রচণ্ড ক্ষুধার কথা তার মনে জাগল।

বৈজ্ঞানিক ভাবলেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে যখন কিছুতেই অতিক্রম করা যাবে না, তখন সময়মত খেয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

খুব সকালে চাষী ভাইয়ের বাড়ীতে যে দুধ-চিঁড়ে কলার ফলার সেরে এসেছিলেন, সেটি তখন বেশ ভালোই লেগেছিল। এখন চিন্তা করে বৈজ্ঞানিক বুঝলেন যে, সে খাদ্য অনেকক্ষণ হজম হয়ে গেছে।

যাক্,—কাজ ত সারা জীবনই আছে। কিন্তু তার মধ্যে আগেকার কর্তব্য আগেই সমাধা করা প্রয়োজন।

এই শম্ভুদা আছে বলেই বৈজ্ঞানিকের সংসার ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত চলে। নইলে কোথায় থাকত তাঁর ল্যাবরেটরী আর কোথায় থাকত তাঁর গবেষণার কাজ।

তরুণ বৈজ্ঞানিক আর কোনো ওজর আপত্তি না তুলে শান্তশিষ্ট ছেলেটির মতো শম্ভুদার আদেশ পালনে তৎপর হয়ে উঠল।

খাওয়ার ভেতরও ওই উড়ন্ত চাকী তার মগজের মধ্যে আনাগোনা সুরু করে দিল।

খাওয়া শেষ করে বৈজ্ঞানিক যখন এক গেলাস জল ঢক্‌ঢক্‌ করে গিলে ফেললে, ঠিক সেই মুহূর্তে শম্ভুদা জিজ্ঞেস করলে, দাদাবাবু, আজকের রান্না কেমন হয়েছে শুনি?

শম্ভুদার কথা শুনে প্রশান্ত হঠাৎ চমকে উঠল।

তাইত! এতক্ষণ ধরে বৈজ্ঞানিক তার ডান হাত দিয়ে কী বস্তু-গুলি মুখের ভেতর পুরে দিচ্ছে—সে কথা ত একবারও ভেবে দেখে নি।

খিদের সময় পেট ভরাতে হবে, এই ছিল তার নির্ধারিত কাজ। কিন্তু ডাল খেলো কি ডালনা খেলো, ঝোল খেলো কি অম্বল খেলো সে কথা ত একবারের জন্যেও বৈজ্ঞানিক ভাবেন নি।

তাই শম্ভুদার প্রশ্ন শুনে সে স্বভাবতই হক্‌চকিয়ে গেল। তাই ত! এতক্ষণ ধরে প্রশান্ত কি খেলেন—কিছুই ত' মনে করতে পারছেন না।

বৈজ্ঞানিক বুঝতে পারলেন, আজ সারাদিন ধরে সেই উড়ন্ত চাকী তাঁর মন একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

অন্যান্য দিন দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর—ইজি চেয়ারে দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে বৈজ্ঞানিক কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম করে থাকেন।

আজ কিন্তু সে কাজটা আর হল না।

সোজাসুজি ল্যাবরেটরীতে ঢুকে একেবারে কাজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

আরো কাগজপত্র, আরো বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে মন আপনা থেকেই ডুবে গেল।

উড়ন্ত চাকী সম্পর্কে তিনি যে এত তথ্য নিজের অজান্তে সংগ্রহ করে রেখেছেন—এ কথা প্রশান্ত নিজেই জানতেন না।

যাই হোক, সারাটা দিন একেবারে মোহাচ্ছন্নের মতো তিনি কাগজপত্রে ডুবে রইলেন।

মাঝে মাঝে নানা কাগজ আর ম্যাগাজিন থেকে নানা তথ্য নোট করে নিলেন।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে।

শম্ভুদা একবার ল্যাবরেটরীতে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে।

আরো কিছুক্ষণ বাদে—শম্ভুদা এসে জিজ্ঞেস করলে,—এইবার তুমি এক কাপ কফি খাবে ত দাদাবাবু?

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা প্রশান্তের এক কাপ গরম কফি চাই—

এটা তার অনেক দিনের অভ্যেস—

কাগজ-পত্র ঘেঁটে আজ সন্ধ্যায় কফির কথাটিও মনে পড়েনি। শম্ভুদার প্রশ্ন শুনে প্রশান্ত বললেন, আরে! কী আশ্চর্য। এখনো তুই আমাকে গরম কফি দিস নি! সেইজন্যেই বুঝি মাথাটা আমার খুলছে না। যা—যা—শীগ্‌গির কফি নিয়ে আয়—শম্ভুদা—যাবি আর আসবি—দেরী করবি নে কিন্তু—

প্রশান্ত এইবার বাইরের দিকে তাকাবার অবকাশ পেলেন। সন্ধ্যের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে।

চারদিকে বাইরের ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকী পোকা সন্ধ্যে-প্রদীপ জ্বালাচ্ছে। একটা ডোবার ধারে কয়েকটি ব্যাঙ ঐক্যতানে মসগুল হয়ে উঠেছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা এই সময় প্রশান্ত সারাদিনের খাটুনির পর গাড়ী নিয়ে একটু ফাঁকা রাস্তায় যায়।

আজ আর যেন উঠে গাড়ী নিয়ে বেরুতে কিছুতেই মন লাগছিল না। কি যেন একটা কাজ বাকী আছে—

কিসের যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করছিলেন—এই তরুণ বৈজ্ঞানিক। আজ আর কোনো মতেই যেন ল্যাবরেটরী ছেড়ে বাইরে বেরুনো চলে না।

কোন অদৃশ্য অচিন্ত্যনীয় অতিথির জন্যে তাঁকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

কিন্তু কে সেই অতিথি অনেক ভেবেও প্রশান্ত সেকথা অনুধাবন করতে পারছিলেন না।

এরই মধ্যে শম্ভুদা এসে কখন এক কাপ কফি দিয়ে গেছে।

একটু একটু করে সেই কফি পান করছেন—আর কিসের কথা যেন ভাবছেন—এই তরুণ বৈজ্ঞানিক।

মাথাটা হঠাৎ এমন করে ঝিম ঝিম করছে কেন? সারাদিন ঠায় বসে কাগজ-পত্র ঘেটেছেন বলেই কি তাঁর এই অবস্থা হয়েছে?

ঠিক বুঝতে পারছেন না তরুণ বৈজ্ঞানিক।

চোখের সামনে বিজলী আলোটা যেন তিনি সইতে পারছেন না। চেয়ার ছেড়ে উঠে আলোটা নিভিয়ে দিতেই একটা নিঃসীম অন্ধকার রাজ্যে যেন ডুবে যেতে লাগলেন।

[চার]

পায়ে ঝিঁঝিঁ লাগলে যেমন একটা অস্বোয়াস্তি অনুভব করা যায় তরুণ বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্কে ঠিক তেমনি একটা ঝিন্ ঝিন্ ভাব ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। মস্তিষ্কের এই কঠোর-মধুর প্রদাহটি কেবলই বৃদ্ধি পেতে লাগল।

অনেকগুলি মাকড়সা যেন তাঁর মগজের ভেতর ঢুকে ক্রমাগত হাঁটাহাঁটি করছে—ঠিক এই রকম তার মনে হতে লাগল।

এ আবার কি অদৃশ্য ইঙ্গিত?

তরুণ বৈজ্ঞানিক ঠিক অনুধাবন করতে পারছিলেন না।

গত দুটো দিন আবোল-তাবোল চিন্তা করতে করতে কি তার মস্তিষ্কে কোনো রোগ জন্মালো?

একবার ভাবলেন, তাঁর কোন পরিচিত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেই যাওয়ার প্রস্তুতির জন্য তাঁকে এই অন্ধকার সমুদ্র সাঁতরে তীরে উত্তীর্ণ হতে হবে। বাইরে বেরিয়ে জামা-প্যান্ট-জুতো মোজা পরতে হবে। গ্যারেজ খুলে গাড়ী বের করতে হবে। তারপর মগজের যা অবস্থা তাতে নিজে গাড়ী চালাতে পারবেন কিনা সেটাও একটা সমস্যা।

মস্তিষ্কের প্রদাহটা আবার যেন বৃদ্ধি পেতে লাগল।

মনে হল,—কোনো দূর অঞ্চল থেকে কে যেন কেবল তাকে আহ্বান করছে।

ডাকটা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল, কি যে ভাষায় আহ্বান আসছে—তরুণ বৈজ্ঞানিক সেটার অর্থ গ্রহণ করতে পারছিলেন না।

তবে কি ভাষাই ভাব প্রকাশের অন্তরায় হল?

আরো কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন তরুণ বৈজ্ঞানিক।

আহ্বান আসছে,—কিন্তু সে ডাকে সাড়া দেবার শক্তি বৈজ্ঞানিকের নেই।

রাশি রাশি সরষে ফুল ফুটে উঠল যেন তার চোখের সামনে।

অথচ বৈজ্ঞানিক বসে আছেন অন্ধকার ল্যাবরেটরীতে।

কেউ এসে হঠাৎ আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল নাকি?

নাঃ, তাও ত নয়।

তরুণ বৈজ্ঞানিক যেভাবে অন্ধকারের মধ্যে বসে ছিলেন—ঠিক সেই ভাবেই নিজের চেয়ারে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছেন।

তিনি কি এমন একটা মস্তিষ্কের প্রদাহে হঠাৎ আক্রান্ত হয়েছেন যে ব্যাধির কথা তাঁর আদৌ জানা নেই?

সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে তিনি হতভম্বের মত বসে রইলেন। একবার ভাবলেন, শম্ভুদাকে ডেকে আলোটা জ্বালিয়ে দিতে বলেন।

প্রাণপণ চেষ্টা করে তিনি ডাকতে লাগলেন।

কিন্তু তাঁর কণ্ঠ দিয়ে এতটুকু সাড়া জাগল না।

তা হলে তিনি এই অন্ধকারের সমুদ্রে কি সারারাত ধরে বসে থাকবেন? যে করেই হোক, মনে তার বল আনতে হবে।

তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষ ভাবছেন কেন?

একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে—তাঁকে অন্ধকারের সমুদ্র থেকে মুক্তি লাভ করতেই হবে—

হঠাৎ তার সামনের দেয়ালে একটি নীল আলোর আভা দেখা গেল। সেই আবছা নীল আলোর ভেতর ধীরে ধীরে ফুটে উঠল একটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি।

তরুণ বৈজ্ঞানিক সেই মূর্ত্তির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না—যখন তিনি দেখলেন গতকালের সেই উড়ন্ত চাকীর আরোহীর মত অবয়ব ধারণ করলেন তিনি।

হ্যাঁ তাঁর ত' ভুল হবার কথা নয়।

দূরবীণের সাহায্যে তিনি এই মূর্ত্তিকেই দেখতে পেয়েছিলেন।

মূর্ত্তিটি আরো স্পষ্ট আরো বৃহদাকার হয়ে দেখা গেল।

মূর্তিটি ইঙ্গিতে একটি গ্রন্থ আনতে বললেন।

সেই গ্রন্থখানির ওপর একটি সূক্ষ্ম নীল আলো গিয়ে পতিত হয়। তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত তাকিয়ে দেখলেন—গ্রন্থটি একটি বাংলা বই।

দারুণ কৌতূহল নিয়ে তিনি বইখানির দিকে এগিয়ে গেলেন।

আরো বিস্ময়ের কথা—

মুহূর্ত মধ্যে তিনি বুঝতে পারলেন, এতক্ষণ ধরে যে মস্তিষ্কের প্রদাহে কষ্ট পাচ্ছিলেন, সেটা একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে।

এখন তিনি একেবারে সুস্থ মানুষ।

তবে এতক্ষণ তিনি কোন্ রোগের আক্রমণে পীড়িত হয়ে ছিলেন?

প্রশান্ত অনুভব করলেন, এতক্ষণ ধরে তিনি যেন এক অজ্ঞাত জগতের আকর্ষণে বিচরণ করছিলেন।

এইবার মনে হল তাঁর চিরকালের চেনা ধূলির ধরণীতে ফিরে এসেছেন। সমগ্র শরীর তাঁর স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু তার সামনের দেয়ালে নীল আলোর আভায় যে মূর্ত্তিটি ভেসে উঠেছে—তাঁর প্রকৃত পরিচয় কি?

সেই বাংলা বইখানির ওপর লাল আলোর রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত সেই বইখানি হাতে তুলে নিলেন।

বইখানির নাম—বিশ্ব পরিচয়!

নানারকম ছবি দিয়ে এই বিশ্বের গ্রহ উপগ্রহের কথা সহজ ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে।

মূর্ত্তিটি ইঙ্গিতে বইখানি খুলতে বললে।

যে পাতায় মঙ্গল গ্রহের ছবিটি আঁকা আছে সেইখানে লাল আলোর ইঙ্গিত ফুটে উঠল।

মূর্ত্তিটি হাবে ভাবে প্রকাশ করতে চাইছেন যে, তিনি মঙ্গল গ্রহের অধিবাসী।

আরো খানিকক্ষণবাদে মঙ্গলের অধিবাসী ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, ওই ভাষা তাঁকে শিখিয়ে দিতে হবে।

এই ইসারা পেয়ে প্রশান্ত খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

তাইত। এই বইখানির মাধ্যমে ত' মঙ্গলের অধিবাসীকে বাংলা ভাষা শিখিয়ে দেয়া যায়।

প্রথমে প্রশান্ত ভাবলেন, মঙ্গলের অধিবাসীকে ইংরাজী-ভাষা শিক্ষা দিলে বৈজ্ঞানিক কাজের বিশেষ সুবিধে হবে।

কিন্তু মঙ্গলের অধিবাসী বাংলা ভাষার ওপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন।

সুতরাং প্রশান্তর মনে আর কোন দ্বিধা থাকল না। তিনি বাংলা বইখানি হাতে নিয়েই অক্ষর পরিচয় করিয়ে দিতে সুরু করে দিলেন।

খুব দ্রুত মস্তিষ্ক পরিচালনা করে মঙ্গলের অধিবাসী বাংলা অক্ষরগুলি চিনে নিলেন।

এ ত' আর ছোট ছেলেকে অক্ষর পরিচয় করানো নয়, দ্রুত ভাব গ্রহণে সক্ষম—বিজ্ঞান শাস্ত্রে উন্নত এমন গ্রহান্তরের অধিবাসীকে অক্ষর পরিচয় করাতে কতটুকু সময় লাগে?

দেখতে দেখতে মঙ্গলের অধিবাসী বাংলা অক্ষরগুলি আর সেই সঙ্গে সংখ্যাগুলিও দিব্যি খেলার ছলে আয়ত্ব করে নিলেন।

প্রশান্ত বুঝতে পারলেন, মঙ্গল গ্রহের অধিবাসী কত দ্রুত পাঠ ও ভাব গ্রহণে সক্ষম।

প্রশান্ত এইবার অতি সহজেই জানতে পারলেন এই সদ্য পরিচিত মঙ্গলবাসীর নাম মিঃ ইন্‌ফিনিট।

মিঃ ইনফিনিট্ বললেন, আমি তোমার সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতে চাই। তা হলে পৃথিবীর সঙ্গে মঙ্গল গ্রহের একটি দীর্ঘস্থায়ী বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

প্রশান্ত উত্তর দিলেন, এর চাইতে আনন্দের সংবাদ আর কিছু হতে পারে না। আমি দীর্ঘকাল ধরে এই উড়ন্ত চাকীর কথা শুনে আসছি। সে বিষয়ে বহু সংবাদ সংগ্রহ করেও রেখেছি। কিন্তু উড়ন্ত চাকী কোন্ গ্রহের অধিবাসী তৈরী করেছেন—আর তারই সাহায্যে সুদূর পৃথিবীর আকাশে উড়ে আসছেন—এ ব্যাপারে আমরা একেবারে অজ্ঞ।

মিঃ ইনফিনিটের মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা গেল। তিনি খানিকক্ষণ চুপচাপ রইলেন। তারপর আবার ঈষৎ হেসে উত্তর দিলেন। তা হলে শুনে রাখো, পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক, একমাত্র মঙ্গল গ্রহের অধিবাসী ছাড়া সারা বিশ্বজগতে কেউ বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি সাধন করতে পারে নি। সে হিসাবে আমাদের পৃথিবীর অগ্রজ বলে অভিহিত করতে পারো।

প্রশান্ত সহজ ভাবে জবাব দিলেন, সে কথা আমরা কিছু কিছু

অনুমান করতে পেরেছি! বিজ্ঞানের পথে মঙ্গল গ্রহ কতদূর অগ্রসর হয়েছে—সে কথা জানবার জন্যে আমাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। এক বিস্ময়কর পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যখন আমাদের আলাপ ও যোগাযোগ স্থাপিত হল—তখন আশা রইল, ভবিষ্যতে আপনাদের সহযোগিতায় আমরা অনেক কিছু জানতে সক্ষম হবো।

মিঃ ইন্‌ফিনিটের মুখে সাফল্যের মৃদু হাসি। তিনি মাথা নেড়ে ছোট ভাইয়ের মনে যেন প্রেরণা সঞ্চার করতে চাইলেন।

মিঃ ইন্‌ফিনিট্ বললেন, আমরাও পৃথিবীর অধিবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে কম আগ্রহশীল নই। যদিও আমরা জানি যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবী অনেক পিছিয়ে আছে, তবু আমাদের এ বিশ্বাস আছে যে, উপযুক্ত সহযোগিতা ও অনুশীলনের ফলে একদিন পৃথিবী বিজ্ঞান চর্চায় অনেক দূর অগ্রসর হয়ে যাবে।

আজকে এইটুকু শুধু তোমায় জানিয়ে রাখি যে, দীর্ঘদিন তপস্যা ও অনুশীলনের ফলে মঙ্গল গ্রহ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। একদিন পৃথিবীও উচ্চতর বিজ্ঞানের সাধনায় জয়যুক্ত হবে। তখন কিন্তু মঙ্গল গ্রহের অধিবাসী উপযুক্ত গুরু-দক্ষিণার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে।

যে নীলাভ আলোয় এতক্ষণ মিঃ ইনফিনিটকে দেখা যাচ্ছিল—হঠাৎ সেই আলোর আভাটা নিভে গেল।

প্রশান্ত বুঝলেন মঙ্গল গ্রহের অধিবাসী তার সঙ্গে আর আলোচনা চালাতে উৎসুক নন।

তবে তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে, একবার যখন যোগাযোগ স্থাপিত হল, তখন তিনি মাঝে মাঝে মিঃ ইনফিনিটের দেখা পাবেন।

দীর্ঘকাল সাধনার পর মানুষ একটা ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারলে যেমন মনে পরম শান্তি লাভ করে থাকেন, আজ প্রশান্তর ঠিক সেই রকম আনন্দ হল।

ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ এইভাবে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ

করেছেন। তখন তাঁরা যে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন, পার্থিব সম্পদ তার কাছে অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়েছে।

আজ প্রশান্তর কেবলই মনে হতে লাগল, তিনি যেন এই ল্যাবরেটরীর মধ্যে সামাবদ্ধ নন। বাইরের বিশাল পৃথিবী আবার তাকে ছাড়িয়ে মহাশূন্য—বিরাট বিশ্ব-জগৎ—, সেই মহাশূন্যের মধ্যে অনাদিকাল ধরে কোন্ গ্রহ-উপগ্রহ কার আকর্ষণে অনবরত কাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে—সে সত্যি বিস্ময়কর ব্যাপার।

আজ প্রশান্ত নিজেকে পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র কীট বলে মনে করতে পারলেন না। তার কেবলই মনে হতে লাগল, এই বিরাট বিশ্ব-জগতের তিনি সামিল হয়ে গেছেন।

হয়ত কোনো বৃহত্তর আর মহত্তর কাজের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তারপর আজ হঠাৎ গ্রহ-তারকাদের ঘূর্ণনের এক শুভ পুণ্যলগ্নে মঙ্গলবাসীর সঙ্গে পরিচিত হলেন। এই সামান্য পরিচয়—কোন্ বৃহৎ সম্ভাবনাকে আহ্বান করে আনবে—সে কথা কে বলতে পারে!

প্রশান্ত একবার ভাবলেন মঙ্গল গ্রহের সঙ্গে তাঁর এই আকস্মিক যোগাযোগের কথা বেশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি হিসেবে প্রেরণ করেন।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবলেন,—বিজ্ঞানের যে নতুন তোরণদ্বার অকস্মাৎ তাঁর সামনে উন্মুক্ত হয়েছে—তার এই অকারণ বিবৃতির ফলে সেই দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে।

সুতরাং এক্ষেত্রে গোপনীয়তা অবলম্বন করাই সর্বাংশে বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিকের সাধনার প্রথম ও প্রধান মন্ত্র হচ্ছে গোপনীয়তা। যতক্ষণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা না যাচ্ছে—ততক্ষণ কোন সংবাদ যেন বাইরে প্রকাশ না পায়।

প্রকাশ পেলেই সাধনায় বিঘ্ন উপস্থিত হবে। মেঘনাদ যদি

সম্পূর্ণ গোপনে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপন করতে পারতেন, তা হলে স্বয়ং রামচন্দ্রও তাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে সক্ষম হতেন না।

কিন্তু ঘর-শত্রু বিভীষণ সেই গোপনীয়তা রক্ষা করতে দেয় নি। তারই ফলে ইন্দ্রজিতের পতন।

প্রশান্ত মনে মনে চিন্তা করে দেখলেন, আশু উত্তেজনার বশে তিনি যদি সত্ত উন্মুক্ত বিজ্ঞানের তোরণ দ্বারের কথা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিতেন,—তা হলে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ তাঁর কিছুতেই সম্পন্ন হত না।

ফলে তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার হত অপমৃত্যু।

প্রশান্ত অনেক কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করলেন।

সেই দিন গভীর রাত্রে তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে সব কিছু জ্ঞাতব্য সংগ্রহ করে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বসলেন।

মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে এ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা যা কিছু জানতে পেরেছেন, যত কিছু আবিষ্কার করেছেন, সব তথ্য অবগত হতে হবে।

নীরব নিস্তব্ধ রজনীই এই সকল গবেষণার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

প্রথমে দেখতে হবে—পৃথিবীর কোন মানমন্দির থেকে এই মঙ্গল গ্রহ কেমন জোরালো টেলিস্কোপে ধরা পড়েছে।

সব ব্যাপারেই নানা মুনির নানা মত।

কোনো সিদ্ধান্তই সর্বজন গ্রাহ্য বলে স্বীকৃত হয় নি।

পৃথিবীতে বহু জোরালো এবং আধুনিক মানমন্দির আছে ঃ

যে সব খ্যাতিমান জ্যোতির্বিদ্ এই সকল মানমন্দিরে গবেষণা করে থাকেন তাঁরা দেখা যাচ্ছে—এক এক জন এক এক রকম অনুমানের ওপর নির্ভর করে মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেছেন মঙ্গল গ্রহ কর্কশ, নিরস, লতা-গুল্ম বিহীন। এখানে জীবিত প্রাণী কিছুতেই বসবাস করতে পারে না।

আর একদল বৈজ্ঞানিক অভিমত প্রকাশ করে[illegible] তাহলে
বিজ্ঞান চর্চায় বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন। তাঁদের অসা[illegible]
তারা বিজ্ঞানের বলে বিরাট বিরাট খাল খনন করেছে[illegible]

বর্তমানে মঙ্গল গ্রহে জলের কোনো অভাব নেই।

গ্রহবাসীর বাসের জন্যে বহু হর্ম্য নির্মিত হয়েছে[illegible]
অট্টালিকার ভিতর ইচ্ছামত তাপ নিয়ন্ত্রণ করা চলে। শুধু তাই নয়—

বিজ্ঞানের বলে মঙ্গলবাসী নিজেদের প্রয়োজন মত বারি বর্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

মঙ্গলবাসী সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের সাহায্যে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

তার ফলে মঙ্গল গ্রহে কখনো বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, মড়ক, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয় না।

ইতিপূর্বে মঙ্গলের উপরিভাগ কঙ্করাবৃত ও কর্কশ ছিল। বর্তমানে সেই পাথুরে মাটির সঙ্গে এক প্রকার বৈজ্ঞানিক লোশন ব্যবহার করার দরুণ সেই মাটি বিশেষ উর্বরা হয়ে উঠেছে।

যদিও পৃথিবীর মাটির মতো মঙ্গলের মাটি অতটা কোমল ও পলিমাটি সঞ্চিত নয়, তবু একথা বলা চলে যে, মঙ্গলের মাটিতে বহুবিধ ফসল ফলে। আগে পাথুরে মাটি ছিল বলে মঙ্গলের উপরি ভাগে বৃক্ষ কিম্বা বনানীর সমাবেশ ছিল না।

বর্তমানে মঙ্গলবাসী বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিরাট বিরাট ঘন বনরাজি নির্মাণ করেছে। ফলে মঙ্গল গ্রহ আর দাবদাহে উত্তপ্ত নয়। বরঞ্চ মালঞ্চ শোভিত ছায়াশীতল হয়েছে।

আর একজন বৈজ্ঞানিক বলেছেন, মঙ্গল গ্রহবাসী বিজ্ঞানের উপযুক্ত ব্যবহার করে উক্ত গ্রহে জন্মনিয়ন্ত্রণ করেছেন।

তবে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে পৃথিবীর বহু নামকরা বৈজ্ঞানিক মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে এত পরস্পর বিরোধী কথা

সম্পূর্ণ যে, শান্ত মনে সে সব কথা আলোচনা করতে গেলে দিশেহারা হয়ে পড়তে হয়।

রাত্রি গভীর হল। কিন্তু প্রশান্তর অনুসন্ধানের বিরাম নেই।

অবশেষে এক সময় শম্ভুদা এসে দেখলে, বুকে একখানি মোটা বই নিয়ে প্রশান্ত অঘোরে ঘুমুচ্ছে। শম্ভুদা আলগোছে বইখানি বুকের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলে।

[পাঁচ]

খুব ভোরে প্রশান্তর ঘুম ভেঙে গেল।

গত রাত্রে বহু পড়াশোনা করেছে প্রশান্ত।

কখন যে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—সে কথা আর তার মনে নেই।

শম্ভুদা নিশ্চয়ই এক সময় এসে আলো নিভিয়ে দিয়ে গেছে।

নইলে তার ভুলের জন্য সারা রাত ধরেই আলো জ্বলত।

তবু এ-কথা সে বুঝতে পারল যে, মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে পড়াশোনা করে সে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে।

তথ্য সংগ্রহ করেছে এ-কথা যেমন সত্যি, সেই সঙ্গে এ-কথাও স্বীকার করতে হবে যে, বহু বৈজ্ঞানিকের মতামত ও গবেষণার কথা পাঠ করে সে একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌছুতে পারে নি।

এইবার তাঁকে মিঃ ইন্‌ফিনিটের সঙ্গে আলোচনায় বসে সব কিছু জেনে নিতে হবে।

সারাটা দিন সে নিজের ল্যাবরেটরীর অন্যান্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকল।

গাড়ীটা নিয়ে একবার নিজের চিকিৎসকের কাছে চলে গেল। ব্লাড প্রেসারটা অনেকদিন 'চেক্' করা হয় নি। সে বিষয়ে একবার

পরীক্ষা করানো প্রয়োজন। নইলে সেদিন অতক্ষণ ▌ তাহলে
মাথা ঝিম্ ঝিম্ করল কেন?

ডাক্তারবাবু ভালো করে প্রশান্তকে পরীক্ষা
বললেন, বর্তমানে আপনার শরীরে কোনো অসুখ নেই
হচ্ছে ইদানীং অতিরিক্ত পরিশ্রম করছেন। দৈনিক পরিশ্রমটা কমিয়ে দিতে হবে। মস্তিষ্ক চালনা চলছে বলে—দুধ, ডিম, ছানা খেতে হবে। তাছাড়া দেহে আর কোনো উপসর্গ নেই।

ল্যাবরেটরীতে ফেরার পথে সেদিনকার একটি দৈনিক কাগজ কিনে প্রশান্ত তাড়াতাড়ি বাসায় চলে এলেন।

বৈজ্ঞানিক বেশীক্ষণ ধরে রৌদ্রে ঘোরাঘুরি করতে পারেন না, তা হলেই মাথা ধরে যায়।

বাসায় ফিরে সেদিনকার কাগজটা খুঁটিয়ে পড়লেন প্রশান্ত। এই একটি তাঁর নতুন কাজ হয়েছে।

কোথায় উড়ন্ত চাকী দেখা গেল সেটার সন্ধান করা। রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলে নাকি চাষীর দল উড়ন্ত চাকী দেখতে পেয়েছে।

ইদানিং রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা নাকি জমা বরফের মধ্যেও ফসল ফলাচ্ছেন। এই খবর ইতিপূর্বে তরুণ বৈজ্ঞানিক—কোনপত্রে যেন পড়েছেন।

কিন্তু সেই বরফ জমা দেখে মঙ্গল গ্রহের অধিবাসীরা কোন্ রত্নের সন্ধান করতে গিয়েছিলেন—সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

বেশ খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে প্রশান্ত শীতল জলে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলেন।

গত রাত্রে বহুক্ষণ ধরে জাগতে হয়েছিল। নানা কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়েছিল। সেইজন্যে এমনিতেই শরীরটা অবসন্ন ছিল। স্নান করার পর দেহটা স্নিগ্ধ হয়েছে বলে মনে হল।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রশান্ত কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

সম্পূর্ণ

তরুণ বৈজ্ঞানিক মনে মনে একটা আশা পোষণ করছেন—আজ সন্ধ্যাবেলায় মিঃ ইন্‌ফিনিটের কাছ থেকে কোনো আহ্বান আসবে কিনা। হয়ত ডাকতে পারে, কিম্বা আদৌ সাড়া পাওয়া যাবে না। তবু মনের কোণে ক্ষণে ক্ষণে একটি ক্ষীণ আশার সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছিল। তরুণ বৈজ্ঞানিকের প্রতি কাজে, আর প্রত্যেকটি চিন্তার মাঝখানে সুরে অনুরনণ অব্যাহত ছিল।

দুপুরবেলা একটা নিটোল ঘুমের পর প্রশান্ত যখন জেগে উঠলেন, —তখন তার শরীরটা ঝরঝরে বলেই মনে হল।

ভাবলেন, শম্ভুদাকে এক কাপ কফির জন্য হাঁক দেবেন কিনা।

কিন্তু হাঁক-ডাকের আর প্রয়োজন হল না।

একটু বাদেই শম্ভুদা এক কাপ ধূমায়িত কফি নিয়ে এসে হাজির হল।

বেশ আমেজ করে—অনেকক্ষণ ধরে তরুণ বৈজ্ঞানিক কফি পান করলেন।

তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে মিঃ ইন্‌ফিনিট্ কি ভাবে তার জীবনে এসে হাজির হল—সেই কথাই ভাবছিলেন।

এখন তার চোখের সাম্‌নে পৃথিবীর আকাশ সূর্যাস্তের আভায় নানা রঙে রঞ্জিত।

ঘর ছাড়া পাখীর দল এই বার আকাশের বুকে মালার মতো নীড়ের পানে উড়ে চলেছিল।

ছোট ছোট মেঘের টুক্‌রো গুলো—মাঝে মাঝে সেই চলন্ত মালাকে ঢেকে ফেলছিল।

আবার একটু বাদেই নীল আকাশের বুকে তাদের দেখা মিলতে লাগল। এই চমৎকার দৃশ্যটিকে ছন্দে গেঁথে একটি সুন্দর কবিতা লেখা যায়।

ছেলেবেলায় প্রশান্ত খাতা ভর্তি করে কবিতা লিখতেন। কিন্তু যখন থেকে বিজ্ঞান-সাধনায় ব্রতী হয়েছেন, কবিতা লক্ষ্মীকে একেবারে ভুলে গেছেন বলা চলে।

আজ যদি প্রশান্ত সব কিছু ভুলে কবিতা লিখতে যান—তাহলে আগের দিনের মতোই ছন্দ আর মিল সে বজায় রাখতে পারবেন কি? না কি পদে পদে তাঁর ছন্দ পতন ঘটবে?

আচ্ছা, এখন মঙ্গল গ্রহের আকাশের কি রূপ?

এই পৃথিবীর তরুণ বৈজ্ঞানিক সে কথা কল্পনা করতে পারেন কি? বিজ্ঞানের মহিমায় মঙ্গল গ্রহের আকাশ কি রূপ নিয়েছে সে কথা এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের জানা নেই। সেখানেও কি পৃথিবীর আকাশের মতো রঙের খেলা চল্‌ছে?

আচ্ছা, মঙ্গল গ্রহের আকাশে কি অনবরত উড়ন্ত চাকী উড়ে বেড়াচ্ছে?

মঙ্গলের অধিবাসীরা কি ইচ্ছে করলেই উড়ন্ত চাকী নিয়ে অসীম শূন্যে উধাও হয়ে যেতে পারে?

অসীম শূন্যে কোনো বাধাই কি তাদের গতি রোধ করতে পারে না? এই সব কথাই তরুণ বৈজ্ঞানিক সিগারেট টানতে টানতে ভাবতে লাগলেন।

এমন সময় কিসের যেন একটা শিহরণ প্রশান্ত অনুভব করলেন। কে যেন তাকে সঙ্কেত করে ডাক্‌ছে।

ঠিক আগের দিনের মতোই মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে—মগজে হাজার মাকড়শার আনাগোনা—

তরুণ বৈজ্ঞানিক তার কাজের ঘরে গিয়ে নিজের চেয়ারটিতে আসন গ্রহণ করলেন।

কোন সুদূর গগন থেকে যেন আহ্বান আসছে—ডাক আসছে ডাক আসছে পৃথিবীর এক তরুণ বৈজ্ঞানিকের কাছে—

তারপর আবার সেই সাম্‌নের দেয়ালে নীল আলোর আভা—! মস্তিষ্কের ভেতর ঝিম্‌ঝিমে একটা কিসের আলোড়ন—

বেশ খানিকক্ষণ চুপ্‌চাপ।

এইবার দেয়ালে ভেসে উঠল—মিঃ ইন্‌ফিনিটের পরিচিত মুখ।

মিঃ ইন্‌ফিনিট সহাস্যবদনে বল্‌লেন, শুভ সন্ধ্যা। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, শুভ সন্ধ্যা মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিক—

মিঃ ইন্‌ফিনিট বললেন, প্রথমেই তোমাকে একটি জরুরী বিষয়ে সচেতন করে দিচ্ছি—

প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলেন, বিষয়টি কি জানতে পারি কি ?

মিঃ ইন্‌ফিনিট উত্তর দিলেন. দেখ ভাই পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক, মঙ্গল গ্রহের অধিবাসীর এ ক্ষমতা আছে যে যখন ইচ্ছে আমি তোমায় দেখা দিতে পারি। কিন্তু একটি প্রয়োজনীয় বিষয় জানাতে হলে তুমি ইচ্ছে মাত্র আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পার না।

প্রশান্ত প্রশ্ন করল, তাহলে এক্ষেত্রে আমায় কি করতে হবে ? মিঃ ইন্‌ফিনিট তাঁকে বুঝিয়ে-বললেন, আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে তোমার এই ল্যাবরেটরীতে এক শক্তিশালী ট্রান্সমিটার বসাতে হবে। সেই ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে তুমি কি ভাবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে—সেই পদ্ধতি আমি তোমায় ভালো করে বুঝিয়ে দেবো। কিন্তু তার আগে তুমি বল দেখি—পৃথিবী ছেড়ে তুমি কখনো এই উড়ন্ত চাকীতে চেপে আমাদের মঙ্গল গ্রহে আসতে চাও কিনা—

প্রশান্ত খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলে, তারপর উত্তর দিলে, আমরা পৃথিবীর মানুষ, উপযুক্ত ভাবে তৈরী না হয়ে কি ভাবে উড়ন্ত চাকীতে উড়তে পারবো—ঠিক বুঝতে পারছি না। সাইকেলে চড়াও ভালো করে শিখে নিতে হয়। উড়ন্ত চাকীতে ওঠার আগে আমার দেহকে সম্পূর্ণ তার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। নয় কি ?

মিঃ ইন্‌ফিনিট উত্তর দিলেন, তুমি যে প্রশ্ন তুলেছ, তা অতি ন্যায় সঙ্গত। তবে একথা নিশ্চয় যে, আমাদের উড়ন্ত চাকীর আরোহী হবার আগে আমিই তোমাকে দেহে-মনে সর্বপ্রকারে ট্রেনিং দিয়ে

নেবো। নইলে তুমি হঠাৎ আমাদের উড়ন্ত চাকীতে আরোহণ করে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতে পারবে কেন ?

প্রশান্ত বললেন, আপনার প্রস্তাব শুনে আমি সত্যি আনন্দিত হলাম মিঃ ইন্‌ফিনিট। পৃথিবীর তরুণ বৈজ্ঞানিক রূপে অপর গ্রহ সম্পর্কে কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। সুযোগ যদি পাই, আর আপনি যদি যথাযথরূপে আমাকে ট্রেনিং দেন, তবে একদিন আপনাদের ওই উড়ন্ত চাকীতে ভ্রমণ করবার সৌভাগ্য আমার নিশ্চয়ই হবে।

মিঃ ইন্‌ফিনিট আনন্দের স্বরে বললেন, হবে বৈ কি। নিশ্চয়ই হবে। আর এই ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতে আমিও কম আগ্রহান্বিত নই—একথা তু'ম ধ্রুব সত্য বলে জেনে রাখো।

প্রশান্ত উত্তর দিলেন, আপনার উৎসাহব্যঞ্জক কথা শুনে আমি সত্যি অনুপ্রাণিত হচ্ছি। মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষ হিসেবে আমার একটা কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক।

তারপর একটু চুপ করে থেকে প্রশান্ত বললেন, আচ্ছা আমি যদি মঙ্গল সম্পর্কে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করি তাহলে কি আপনি আমার উত্তর দেবেন ?

মিঃ ইন্‌ফিনিট উৎসাহিত হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই। উত্তর দেবো বৈ কি। একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে—পৃথিবীর একজন বৈজ্ঞানিককে আমাদের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার কথা বলতে আমার ভালই লাগবে।

প্রশান্ত জবাব দিলেন, আপনার উত্তর শুনে আমি খুব উৎসাহ বোধ করছি মিঃ ইন্‌ফিনিট। আচ্ছা, আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, মঙ্গল গ্রহে আমাদের পৃথিবীর মতো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বর্তমান আছে কিনা ?

মিঃ ইন্‌ফিনিট প্রশান্তর প্রশ্ন শুনে হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, আমাদের মঙ্গল গ্রহে পৃথিবীর মতো ওই জাতীয় কোন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নেই। মঙ্গলবাসিগণ বিজ্ঞানের সহজ ব্যবস্থায় যে কোনো

সময় মঙ্গল গ্রহের বৃত্ত অতিক্রম করে মহাশূন্যে পাড়ি দিতে পারে। তা ছাড়া আমাদের উদ্ভাবিত উড়ন্ত চাকী এই সৌরজগতের যে কোনো অঞ্চলে পরিভ্রমণ করতে পারে। তাতে তার কোনো অসুবিধা নেই।

এইবার প্রশান্ত জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, মঙ্গল গ্রহের খাদ্য সমস্যার কি ভাবে সমাধান হয়? মঙ্গলের মাটিতে কি ধরণের ফসল ফলে? কি খাদ্য খেয়ে মঙ্গলবাসা জীবনধারণ করে?

এই প্রশ্ন শুনে মিঃ ইন্‌ফিনিটের মুখ তৃপ্তির আনন্দে ভরে গেল। তিনি খানিকক্ষণ কৌতুকের দৃষ্টিতে প্রশান্তর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বল্‌লেন, মঙ্গলের অধিবাসীরা বহুকাল এই অধ্যায় অতিক্রম করে এসেছে। জমিতে ফসল ফলিয়ে সেই ফসল কষ্ট করে নানা অঞ্চলে প্রেরণ করে তাদের জীবনধারণ করতে হয় না। আমি আগেও বলেছি—বিজ্ঞানের সাহায্যে মঙ্গলবাসী অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে। ভূমি কর্ষণ করবার দায়িত্ব আর তাকে পালন করতে হয় না। মঙ্গলের বৈজ্ঞানিকেরা এক প্রকার 'পিল' তৈরী করেছেন, প্রয়োজন মতো সেই 'পিল' গ্রহণ করলেই—মঙ্গলবাসীর অটুট স্বাস্থ্য বজায় থাকে।

প্রশান্ত অনেকটা হতাশার সুরে বল্‌লেন, আমাদেরও কঠিন পরিশ্রম করে জমি চাষ করতে হয়। ভারতবর্ষের মতো দেশে কাঠের লাঙল আর গরুর সাহায্যে ভূমি কর্ষণ করতে হয়। তারপর অতিবৃষ্টি, অতিরৌদ্র, পোকা, পঙ্গপাল, ইঁদুরের হাত থেকে কষ্ট করে সেই ফসল রক্ষা করে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করতে হয়। আর শুধু ফসল উৎপন্ন করলেই তা' হবে না। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রুচি অনুসারে খাদ্য রান্না করতে হয়। ক্ষুধার জন্য খাদ্য জোগাড় করতেই পৃথিবীর মানুষের অর্ধেক সময় ব্যয় হয়ে যায়।

এই কথা শুনে মিঃ ইন্‌ফিনিট ভারি কৌতুক বোধ করলেন। তিনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন. মঙ্গলের অধিবাসী বিজ্ঞানের

সাহায্যে এই জাতীয় কাজকে একেবারে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে। আমি তোমাকে আগেই জানিয়েছি—মঙ্গলের বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্য ও পরমায়ু বৃদ্ধি করার সহজ উপায় আবিষ্কার করে অতীতকাল থেকেই খাদ্য সমস্যার একেবারে সমাধান করে ফেলেছেন। মঙ্গলের বৈজ্ঞানিকদের হাতে এখন অফুরন্ত কাজ। কিন্তু সে কাজ মিছেই দিনগত পাপক্ষয় নয়। কত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে যে আমরা ব্যস্ত থাকি—সে কথা তোমরা ধারণাতেই আনতে পারবে না।

পৃথিবীর তরুণ বৈজ্ঞানিক বল্‌লেন, মিঃ ইনফিনিট, সত্যি আপনার কথা শুনে বিস্ময় বোধ করছি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে প্রশান্ত বললেন, আমরা পৃথিবীর অধিবাসী বিজ্ঞান চর্চায় এখনো কত পেছনে পড়ে আছি সেকথা ভেবে আমি সত্যি লজ্জা বোধ করছি—

মিঃ ইন্‌ফিনিট তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন। এতে লজ্জিত হবার কিছু নেই। মঙ্গল গ্রহের অধিবাসী দীর্ঘকাল ধরে সাধনা করে বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে জয়যুক্ত হয়েছে। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, একদিনে মঙ্গল সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেনি। এই সৌর-জগতে এমন বহু গ্রহ উপগ্রহ আছে যারা এখনো অজ্ঞানতার অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে আছে। বহু গ্রহে জীবিত প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায় নি। এ সম্পর্কে মঙ্গলের বৈজ্ঞানিক ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। এই উড়ন্ত চাকী তার একটি উপায় মাত্র।

প্রশান্ত এবার খানিকটা নীরব থেকে মনে মনে ভাবল, পৃথিবী শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের জন্য নিজেকে কত অসহায় বোধ করে।

প্রকাশ্যে মিঃ ইন্‌ফিনিটকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ আপনাকে আমার আর একটি কৌতূহলের কথার উত্তর দিতে অনুরোধ করছি। সে বিষয়টি হচ্ছে, মঙ্গল-গ্রহের যান-বাহনের ব্যবস্থা। মঙ্গলের জল আর মাটিতে কি ভাবে যান-বাহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে? পৃথিবীর

সঙ্গে তার কোনো সামঞ্জস্য আছে কিনা? আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আমাদের পৃথিবীতে অতি মন্থর গরুর গাড়ী থেকে সুরু করে দ্রুতগামী বিমানের পর্যন্ত ব্যবস্থা আছে।

মিঃ ইন্‌ফিনিট উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, এটা একটা জানবার বিষয় বটে। আচ্ছা, তবে খোলাখুলি ভাবেই জানিয়ে দিচ্ছি।

মঙ্গল গ্রহের উপরিভাগ আগে মোটেই যান-বাহন চলাচলের উপযুক্ত ছিল না। কিন্তু মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিক সেই অতীতকালে অসামান্য পরিশ্রম করে সমান্তরাল ভাবে বহু দীর্ঘ খাল খনন করেছেন। মঙ্গল গ্রহের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে তুষারপাত হয়। সেই তুষার যখন গলে যায়, তখন ওই সব দীর্ঘ খাল ধরে প্রচুর জল চলাচল করে। এই সব খাল দিয়ে দ্রুত জলযান সব সময়েই যাতায়াত করে। এছাড়া স্থলভাগে চলবার জন্য মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিক বহু দ্রুত যান-বাহনের আবিষ্কার করেছেন। তারা এত জোরে চলে যে চক্ষের পলকে এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে পৌঁছে যায়। এই সব যানের ভেতরে স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের সকল রকমের ব্যবস্থাই আছে।

[ছয়]

পরদিন তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত তাঁর নিজের ল্যাবরেটরীতে বসে আপন মনে ভাবছিলেন, পৃথিবীর বুকে এত বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিক থাকতে মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিক মিঃ ইন্‌ফিনিট তাঁর কাছে এলেন কেন? আরো আশ্চর্যের কথা, তিনি উড়ন্ত চাকীতে উঠে তাঁকে মঙ্গল গ্রহে যাবার সাদর আমন্ত্রণ জানালেন কেন?

অবশ্য মঙ্গল গ্রহে বিজ্ঞানের যে রাজসূয় যজ্ঞ চলছে—তার

প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে সেখানকার কর্মকাণ্ড স্বচক্ষে দেখা নেহাৎই ভাগ্যের কথা।

এই সুযোগ লাভের জন্য পৃথিবীর ছোট বড় কত বৈজ্ঞানিকই ত লালায়িত হয়ে উঠবেন।

কিন্তু প্রশান্তর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে—একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারছেন না।

একটা কথা প্রশান্তর মনে জেগেছে যে, মঙ্গলের বৈজ্ঞানিক মিঃ ইনফিনিট যদি তাকে নির্বাচন আর গ্রহণ করেন—তাহলে শিক্ষানবীশ হিসেবেই তাকে নিয়ে যাবেন।

এসব ক্ষেত্রে অল্প বয়সের উদ্যমশীল মানুষই সকল দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয়। কেননা বিজ্ঞান চর্চার অনুশীলনে সে কোনো রকম পরিশ্রম করতেই পরান্মুখ হবে না। বৈজ্ঞানিক হিসেবে গালভারী—নাম যাদের আছে—তারা অপর গ্রহে গিয়ে নিজের সকল গরিমা বিসর্জন দিয়ে শুধু মাত্র শিক্ষানবীশ হতে সম্মত হবেন কেন?

এই সব নানা চিন্তা তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্তর মনে আনাগোনা করতে থাকল।

আর একটা দিক প্রশান্ত ভেবে দেখেছেন যে, তিনি বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য আজও বিবাহ করেন নি।

সংসারে তার আর কেউ নেই।

এক দূর সম্পর্কের মামা আছেন।

তিনি দূর পল্লীগ্রামে থাকেন।

তিনি ছা পোষা গেরস্ত মানুষ। প্রশান্তর সঙ্গে কোনো যোগাযোগও তাঁর নেই।

প্রকৃত পক্ষে ভাগনের তিনি খবরই রাখেন না। পিছটান বলতে যা বোঝায় প্রশান্তর তা কিছুই নেই।

তার জীবনের একমাত্র বন্ধন—শম্ভুদা।

এই শম্ভুদার আদর-যত্ন আর অভিভাবকতাতেই প্রশান্ত কোনো

রকমে দুবেলা দুটি খেয়ে বেঁচে আছে, আর আপন খেয়াল খুশী মতো বিজ্ঞান চর্চা করে চলেছে।

যদি সত্যি তাঁকে অন্য গ্রহে পাড়ি দিতে হয়—তা হলে না হয় শম্ভুদার জন্যে কিছু অর্থের সংস্থান করে দিয়ে যেতে হবে।

ইতিমধ্যে মিঃ ইন্‌ফিনিটের পরামর্শে ও সহযোগিতায় প্রশান্ত তাঁর ল্যাবরেটরীতে একটি শক্তিশালী ট্রান্সমিটার বসিয়ে নিয়েছেন। এই ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে তিনি প্রয়োজন হলেই মঙ্গলবাসী মিঃ ইন্‌ফিনিটের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন।

এছাড়া মিঃ ইন্‌ফিনিট ত' তাঁর ইচ্ছানুসারে যখন-তখন তাঁকে ডাকতে পারবেন আর নানারকম আলোচনা করতে পারবেন।

মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে যেমন প্রশান্তর কৌতূহলের সীমা নেই, তেমনি মিঃ ইন্‌ফিনিটও পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চেয়েছেন।

পর পর সাজিয়ে নিলে প্রশ্নগুলি অনেকটা এই রকম দাঁড়ায়ঃ

ঃ পৃথিবীর মধ্যে কোন্ দেশ (অথবা কোন্ রাষ্ট্র) বিজ্ঞানে বিশেষ অগ্রসর ?

ঃ কোন রাষ্ট্র মহাশূন্যে রকেট উৎক্ষেপণ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে ?

ঃ অপর গ্রহে অবতরণ করবার বাসনা কাদের আছে ?

ঃ ধনের দিক দিয়ে কোন্ রাষ্ট্র এই রকেট উৎক্ষেপণের কাজে অজস্র অর্থ ব্যয় করে চলেছে ?

ঃ পৃথিবীর কোন্ রাষ্ট্র শিক্ষার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ?

ঃ পৃথিবীর কোন্ রাষ্ট্র সৈন্য বিভাগের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করছে ?

ঃ পৃথিবীর কোন্ রাষ্ট্রে আদৌ খাদ্যাভাব নেই ?

ঃ রোগে ভুগে কোন্ দেশের মানুষ বেশী মরে ?

ঃ কোন্ রাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা সব চাইতে বেশী ?

এই জাতীয় বহু প্রশ্ন মিঃ ইন্‌ফিনিট প্রশান্তর উদ্দেশ্যে বুলেটের মতো ছেড়েছেন।

কথা-প্রসঙ্গে মিঃ ইন্‌ফিনিট একথাও জানালেন যে, তিনি পৃথিবী সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ একটি গ্রন্থ লিখছেন। এই ব্যাপারে তাঁকে নানা-ভাবে সাহায্য করতে হবে।

প্রশান্ত আনন্দের সঙ্গেই সম্মতি দান করেছেন।

মিঃ ইন্‌ফিনিট একথাও তাঁকে জানিয়েছেন যে, সেই গ্রন্থে পৃথিবীর তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্তর নাম ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মুদ্রিত থাকবে।

এই কথা শুনে প্রশান্ত রীতিমত রোমাঞ্চ অনুভব করেছেন। কে বলতে পারে কত বর্ষ পরে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদল যখন মঙ্গল গ্রহে পাড়ি জমাবার সুযোগ লাভ করবেন,—সেই সময় মঙ্গলে উপস্থিত হয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে পাঠ করবেন—পৃথিবীর বিবরণ ইতিপূর্বেই মঙ্গল গ্রহে লিখিত ও প্রচারিত হয়েছে।

শুধু তাই নয়,—পৃথিবীর এক তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত সুদূর পৃথিবীর বুকে বসে এই সব সংবাদ ও তথ্য পরিবেশন করেছেন।

তেমন দিন কি সত্যি তাঁর জীবনে আসবে?

মিঃ ইন্‌ফিনিটের অনুরোধ অনুসারে প্রশান্ত নানা রকম সংবাদ সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

একদিন মিঃ ইন্‌ফিনিট গভীর রাত্রে তাঁকে জাগিয়ে তুললেন। কি ব্যাপার?

মিঃ ইন্‌ফিনিট পৃথিবীর বুকে যত বিখ্যাত মানমন্দির আছে, তার ফটো সংগ্রহ করতে চান। আর প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য মানমন্দির সম্পর্কে তথ্য ও বিবরণী লিপিবদ্ধ করে নিতে চান।

প্রশান্ত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এই সব তথ্য আপনার প্রস্তাবিত গ্রন্থখানিতে সন্নিবেশ করতে উৎসুক?

মিঃ ইন্‌ফিনিট উল্লসিত হয়ে উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই।

তোমার সাহায্য ছাড়া এই সব ফটো কিছুতেই জোগাড় করা যাবে না, সে কথা আমি বেশ ভালো করেই জানি।

প্রশান্ত মনে মনে গর্ব অনুভব করলেন যে, তিনি ধীরে ধীরে বিশ্বাসযোগ্য একটি কাজের মানুষ হয়ে উঠছেন।

এত বড় একটা কর্ম-যজ্ঞে তিনি পৃথিবীর বুকে বসেই মঙ্গলের শরিক হতে চলেছেন—ওটাও কম আনন্দের কথা নয়।

মিঃ ইন্‌ফিনিটের অনুরোধের অন্ত নেই।

—বুঝলে ভাই প্রশান্ত, পৃথিবী সম্পর্কিত এই গ্রন্থখানি আমি এমনভাবে সংকলন করবো যে, আগামী দিনের বৈজ্ঞানিকেরা এর ভেতর সব কিছু খুঁজে পাবেন। আর তার সমস্ত দায়িত্ব আর কৃতিত্ব তোমার।

মিঃ ইন্‌ফিনিটের কাছ থেকে যখন এই সব উৎসাহ-বাণী পান তখন প্রশান্তর মনে হয়—পৃথিবীর সঙ্গে মঙ্গল গ্রহের যোগাযোগ যেন সমাধা করেছেন। একদিন মঙ্গল আর পৃথিবী একযোগে এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের সব কিছু কৃতিত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

প্রশান্ত ভেবে-চিন্তে স্থির করলেন, মঙ্গল গ্রহের মিঃ ইনফিনিটের সব কিছু অনুরোধ তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন।

প্রথমেই প্রশান্ত একটা তালিকা প্রস্তুত করলেন :

পৃথিবীর কোথায় কোথায় উল্লেখযোগ্য মানমন্দির আছে।

অনেক মান-মন্দিরের ফটো মহাকাশ বিজ্ঞানের বহুবিধ জার্নালে ইতিপূর্বেই ছাপা হয়েছে।

সেগুলি খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে।

তা ছাড়া অন্যান্য দেশে ছোট বড় আরো অনেক মানমন্দির আছে। তার খোঁজ জোগাড় করা খুব কষ্ট সাধ্য হবে না।

কেন না—ইউরোপের লণ্ডনে, ফ্রান্সে, জার্মানীতে আর সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রশান্তর অনেক তরুণ বৈজ্ঞানিক বন্ধু আছেন।

তাঁদের সঙ্গে বরাবরই প্রশান্তর চিঠিপত্রে যোগাযোগ আছে।

এই সব বৈজ্ঞানিকদের কাছে চিঠি লিখলে বহু অজানা-সংবাদ জানা যাবে। প্রশান্ত মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করলেন যে, মিঃ ইন্‌ফিনিটের এই প্রচেষ্টা যাতে সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়, সেজন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা ও ও পরিশ্রম করে যাবেন।

দীর্ঘরাত জেগে তিনি আপনাকে এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিলেন।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নেমে দেখা গেল, পদে পদে বহু বিঘ্ন, অনেক অসুবিধা ছড়িয়ে আছে।

পুরাতন পরিচিতের মধ্যে অনেকের কাছে চিঠি লিখে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অনেকে ইতিমধ্যে স্থান পরিবর্ত্তন করে অন্যত্র চলে গেছেন। অনেক তরুণ বৈজ্ঞানিক তাদের কর্মক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করেছেন। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সংবাদ ও ফটো ইত্যাদি সংগৃহীত হবে বলে অনুমান করা গিয়েছিল—আসলে কিন্তু সেদিকে কোনো সুবিধে হল না।

প্রশান্ত কাজের দায়িত্ব নিয়ে সত্যি অপ্রস্তুতে পড়লেন। হঠাৎ মিঃ ইন্‌ফিনিট এক গভীর রাত্রে হাজির।

—কি প্রশান্ত, তোমার কাজ কত দূর এগোলো? ইতিমধ্যে এয়ার মেলে সব চিঠি ছেড়েছ ত?

—এয়ার মেলে চিঠি দিয়েও অনেক বিঘ্ন ওৎ পেতে আছে। প্রশান্ত তার অসুবিধের কথা মিঃ ইন্‌ফিনিটকে বুঝিয়ে বললেন।

মিঃ ইন্‌ফিনিট সব কিছু শুনে খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। তারপর সামনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কইলেন, শোনো প্রশান্ত, আমরা মঙ্গলের অধিবাসী, যখন একটা কাজে হাত দি—তখন সেই নির্ধারিত কাজ সমাধা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মনে এতটুকু শান্তি থাকে না। ওই যে তোমাদের শাস্ত্রে বলে না—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। মঙ্গল বাসীদের কাজের ধারাও ঠিক তাই।

একটু নীরব থেকে মিঃ ইন্‌ফিনিট আবার কইলেন, অবশ্য আমি তোমায় দোষ দিচ্ছিনে। পৃথিবীব কর্মের রথচক্র একটু মন্থর গতিতে চলে। ওই যে তুমি আমার কাছে তোমাদের পল্লী অঞ্চলের গরুর গাড়ীর কথা বলেছিলে,—মঙ্গলের তুলনায় পৃথিবীর কাজে গতি অনেকটা ঠিক সেই রকম ধীর।

প্রশান্ত অতি উৎসাহে এই কাজের দায়িত্বটা নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের ধারণা ছিল—অতি সহজেই তিনি এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

কিন্তু এখন সে মুখ তার থাকল না দেখে, তিনিও কিছু সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছেন।

তাই ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আমার এখন কি করা উচিত—আপনিই পরামর্শ দিন না মিঃ ইন্‌ফিনিট।

মিঃ ইন্‌ফিনিট সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন এতে এত ভাবনার কি আছে? প্রতিটি উদ্দেশ্য সাধনের পথে বিঘ্ন আসতে পারে। কিন্তু তাই বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে ত হবে না—

প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে অন্য কোন্ পথে আমরা অগ্রসর হতে পারি।

মিঃ ইন্‌ফিনিট উত্তর দিলেন, তুমি বিমান পথে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ো। আমার ত মনে হয় এ ব্যাপারে এত চিন্তা করবার কিছু নেই।

মঙ্গলের বৈজ্ঞানিকের মুখে এই কথা শুনে প্রশান্তের মুখখানি মলিন হয়ে এলো।

প্রথমটা তিনি এই কথার কোন জবাব দিতে পারলেন না।

একটু ভেবে নিয়ে তারপর তিনি বললেন, শুনুন মিঃ ইন্‌ফিনিট আমি পৃথিবীর এক স্বল্প আয়ের বৈজ্ঞানিক। আমার এমন সামর্থ্য নেই—যে, আপনাদের উড়ন্ত চাকী নিয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দেবার মতো সারা পৃথিবী বহু অর্থ ব্যয়ে পরিভ্রমণ করতে পারি।

তাঁর এই কথা শুনে মিঃ ইন্‌ফিনিট কৌতুকের সুরে উত্তর দিলেন. আরে তার জন্য তুমি এত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? কাজটা আমাকে সমাধা করতে হবে—এইটেই ত' বড় কথা। তার সব রকম ব্যবস্থা করার জন্য ত আমি হাত বাড়িয়েই আছি—

প্রশান্ত অবাক হয়ে উত্তর দিলে, কিন্তু আমাদের দেশের মুদ্রা আপনি সংগ্রহ করবেন কি করে? মঙ্গল গ্রহের নোট ত আর আমাদের দেশে চালু নেই। সে ক্ষেত্রে আপনি আমাকে কি সাহায্য করতে পারবেন?

মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিক মৃদুহাস্যে বললেন, সে জন্যও তোমায় কিছুমাত্র চিন্তা করতে হবে না। স্বর্ণের বিনিময়ে আশা করি পৃথিবীতে সব কাজ সমাধা করা চলবে। এ সমস্যা সমাধানের সব দায়িত্ব আমার হাতে সঁপে দিয়ে তুমি পৃথিবী ভ্রমণের জন্যে প্রস্তুত হও।

প্রশান্ত অবাক হয়ে মিঃ ইন্‌ফিনিটের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

শুধু মনে মনে ভাবলেন, মঙ্গল গ্রহের অধিবাসীরা কি বিজ্ঞানের দৌলতে এত বেশী ধনী হয়েছে যে, কথায় কথায় তারা স্বর্ণ ভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিতে পারে?

কি জানি হবেও বা।

আগেই বলা হয়েছে যে, তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্তের তিনকুলে কেউ নেই। কাজেই এই পৃথিবী ভ্রমণের ব্যাপারে—সংসারের ভাবনা ভেবে তাকে বিশেষ বিব্রত হতে হবে না।

এক মাত্র চিন্তার বিষয় ছিল—প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা। সে সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছেন, মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক মিঃইন্‌ফিনিট।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে বিদেশ ভ্রমণের বাসনা—প্রশান্তের মনে বহুকাল বাসা বেঁধে ছিল।

আজ অকস্মাৎ সেই অভাবনীয় সুযোগ লাভ করে প্রশান্ত মনে মনে খুশী হয়ে উঠল।

এক চিন্তার কথা—তার এই বহু দিনের সাধনার ক্ষেত্রে ল্যাবোরেটরীটা কি ভাবে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে যাবেন ?

হঠাৎ প্রশান্তর মনে হল—তাঁর এক বৈজ্ঞানিক বন্ধু স্থান ও ল্যাবোরেটরীর অভাবে নিজের মনোমত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করতে পারছে না।

তাকে যদি খবর দিয়ে এই ল্যাবোরেটরীর দায়িত্ব দিয়ে যাওয়া যায়—তা সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে।

প্রথম কথা, নিজের ল্যাবোরেটরীর জন্য তাঁর আর কোনো চিন্তা থাকবে না। বন্ধু তার গবেষণা চালাতে পেরে খুশী হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে শম্ভুদার সমস্যারও সর্ব রকমে সমাধান হয়ে যাবে।

নইলে এই বৃদ্ধ বয়সে বুড়ো মানুষটা যাবে কোথায় ?

সব শুভ কাজেই বিঘ্ন আসে।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সকল সময়েই এই কথা বলে থাকেন।

অন্ততঃ প্রশান্তের এই শুভ কাজের সামনে কোন বিঘ্ন এসে যে হাজির হল না, এটা দেখে বুঝে তিনি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

ইতিমধ্যে মিঃ ইন্‌ফিনিট এসে অর্থের সমাধান করে দিয়ে গেছেন। উৎসাহও দিয়েছেন প্রচুর।

তারপর কোথায় পাসপোর্ট, কোথায় ভিসা, কোথায় ট্রাভেলার্স চেক—সব কিছুর জন্যই তাঁকে দিনরাত ছুটোছুটি করতে হল।

সব কিছু যখন হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়ল—তখন প্রশান্তর মনটা সত্যি মুক্তির আকাশে উধাও হল।

॥ সাত ॥

প্রথমে প্রশান্ত পাড়ি দিলেন লণ্ডনে।

সেখানে তার অনেক তরুণ বন্ধু স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

অনেকে লণ্ডনে ও আশেপাশের পল্লী অঞ্চলে বাড়ী কিনে বাগান করে দিব্যি বিদেশের মানুষ হয়ে গেছেন।

কয়েকজন বন্ধুকে আগে থেকে টেলিগ্রাম করেছিলেন প্রশান্ত।

তাঁরা এয়ার পোর্টে উপস্থিত ছিলেন।

হঠাৎ বন্ধুকে লণ্ডনে আসতে দেখে তাঁরাও কম বিস্মিত হন নি।

প্রশান্ত মনে করেছিলেন, কোনো হোটেলে আস্তানা নেবেন।

কিন্তু বন্ধুদের আন্তরিকতায় সে ইচ্ছা পরিবর্ত্তন করতে হল। সবাই প্রশান্তকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতে উৎসুক।

প্রশান্ত ভেবে দেখলেন, বিভিন্ন অঞ্চলে দু'চার দিন করে বাস করলে তাঁর দেশ দেখাও হবে --আর যে কাজের জন্য তার এই পৃথিবী ভ্রমণ সেটা দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হতে পারবে।

প্রশান্ত তাই একটা তালিকা তৈরী করে ফেল্লেন।

কোন্ অঞ্চলে, কার বাড়ীতে কতদিন থাকবেন তারই মোটামুটি কর্মসূচি।

ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকদের প্রায় সকলের অবস্থাই মোটামুটি ভাল। ভারতের বৈজ্ঞানিকদের মতো 'অন্ন ভক্ষ ধনুর্গুণ' নয়।

অবশ্য ইংলণ্ডের তরুণ বৈজ্ঞানিকেরা ভারতবর্ষের বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে জানবার জন্যে বিশেষ উৎসুক।

প্রশান্তকে তাঁদের বহু কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর দিতে হল। ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকেরা যেন জ্বলন্ত ও সদা জাগ্রত কর্ম কাণ্ডের মধ্যে বাস করেন। তাদের কর্মপন্থা ও কর্ম প্রচেষ্টা দেখে প্রশান্তর মনে হয়—ভারত বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান গবেষণায় কত পেছিয়ে আছে।

তাদের দেশে প্রকৃতপক্ষে ভালো গবেষণাগার কোথায়? বিজ্ঞানের বিরাট যজ্ঞশালা নির্মাণ করে তাঁরা সত্যিকারের ঋত্বিকদের আহ্বান জানাতে পারেন নি। নিজেরাও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সাধনার বেদীতলে সমবেত হতে পারেন নি।

তাই স্বাধীন ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সাধনার কথা বল্‌তে গিয়ে প্রশান্ত স্বভাবতই কুন্ঠিত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

এই ভাবে তাঁর নিজের কাজ মন্থর গতিতে অগ্রসর হতে থাকে।

একদিন গভীর রাত্রে প্রশান্ত তার এক বন্ধুর বাড়ীতে নিজের কক্ষের অর্গল বন্ধ করে এ পর্য্যন্ত তোলা মান-মন্দিরের ফটোগুলি দেখে—তার বিবরণী লিপিবদ্ধ করছিলেন,—এমন সময় তাঁর মস্তিষ্কে আবার প্রদাহ শুরু হল।

পূর্ব অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝতে পারলেন—মঙ্গল গ্রহ থেকে তাঁর আহ্বান এসেছে—

তিনি প্রস্তুত হয়ে সাম্‌নের দেয়ালের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

আরো কিছুক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে মিঃ ইন্‌ফিনিটের মূর্ত্তি দেয়ালে ফুটে উঠল।

মিঃ ইন্‌ফিনিট প্রশান্তকে জিজ্ঞেস করলেন, তার সঙ্কল্পের কাজ কতদূর অগ্রসর হচ্ছে?

প্রশান্ত উত্তর দিলেন, কোনো কাজই বাধা-বিঘ্নহীন ভাবে প্রশান্ত মনে করার উপায় নেই। বহু মান-মন্দিরের ভেতরকার ফটো কর্তৃপক্ষ তুল্‌তে দিতে আপত্তি জানান। অনেকক্ষেত্রে অনুমতি নিতেও নানা কারণে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। অনেকেই হয়ত ইচ্ছে করেই তাঁর দিকে সহযোগিতার হাত এগিয়ে দিচ্ছেন না—

মিঃ ইন্‌ফিনিট জিজ্ঞেস করলেন, ভারতের বৈজ্ঞানিকের এই কৌতূহল কি তাঁরা সন্দেহের চক্ষে দেখ্‌ছেন?

প্রশান্ত স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর দান করলেন, অনেকটা তাই বটে। ভারতের বৈজ্ঞানিকেরা যে তাদের কর্ম-নৈপুণ্যে বিজ্ঞান ক্ষেত্রে

নতুন কিছু করতে পারবেন সেকথা বিদেশী বৈজ্ঞানিকেরা—বিশেষ করে ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক দল বিশ্বাস করতে চাইছেন না।

মিঃ ইন্‌ফিনিট অবাক হবার কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—এ ত' বড় আশ্চর্য কথা। একজন বৈজ্ঞানিক অপর রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে সহজ ভাবেই সহযোগিতা কামনা করবেন। নইলে বিজ্ঞান সাধনার ধারা অব্যাহত থাকবে কি করে? তা না করে এক দেশের বৈজ্ঞানিক অপর দেশের বৈজ্ঞানিককে যদি সন্দেহের চোখে দেখেন—তা হলে বিজ্ঞান চর্চার ধারা যে বাধা প্রাপ্ত হবে সে কথা বৈজ্ঞানিকদের অনুধাবন করা উচিত। বৈজ্ঞানিকরা হবেন—সকল দেশের গণ্ডীর আর সমস্ত রাজনীতির উর্ধে। নইলে বিজ্ঞানের জয় যাত্রা অব্যাহত থাকবে কি ভাবে?

প্রশান্ত উত্তর দিলেন, সে কথা সত্যি। কিন্তু পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের নানা কারণে হাত পা বাঁধা। রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় অনেক সময় এই বৈজ্ঞানিকদের হাত-পা বাঁধা থাকে। এই ত' ইংলণ্ডে এসে আমি দারুণ অসুবিধা ভোগ করছি,—কোনো মান-মন্দিরের কর্তৃপক্ষ তাদের নিজ নিজ মানমন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের ফটো তুলতে দেবেন না।

মিঃ ইন্‌ফিনিট নিজের মাথা নেড়ে অবিশ্বাসের হাসি হাসতে লাগলেন। বাঁকা ঠোঁটে বিদ্রুপ জাগিয়ে বল্‌লেন, এটা কি করে সম্ভব—আমি ত' কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। একজনের অগ্রগতি দেখে আর একজন চলার পথে পা বাড়িয়ে দেবে এইটেই ত' স্বাভাবিক।

—কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হবার উপায় নেই।

ক্ষোভের স্বরে উত্তর করলেন প্রশান্ত।

তিনি আবার মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিলেন, আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র নানা কারণে পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখে যাবে। হঠাৎ তাদেরও দোষ দেয়া যায় না। কারণ প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যেই একটা

প্রতিযোগিতার ব্যাপার গোপনে লুকিয়ে থাকে। এই ভাবটা দূর করা বড় শক্ত।

মঙ্গলের বৈজ্ঞানিক অসহিষ্ণুভাবে নিজের মাথা নাড়তে লাগলেন। তারপর তাঁর চোখ দুটি কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তিনি ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি এনে বল্‌লেন, আমি এই সমস্যার একটা আশু সমাধান করতে পারি ?

প্রশান্তের মুখে একটু ঔৎসুক্য জেগে উঠল।

তিনি কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন,—কি ভাবে তাহলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে ?

মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিক মিঃ ইন্‌ফিনিট উত্তর দিলেন, তোমার ক্যামেরার সঙ্গে আমি এমন একটি প্লাগ লাগিয়ে দিতে পারি যার ফলে ঐ ক্যামেরা কয়েক ঘণ্টার জন্যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তখন তুমি খুশী মতো ফটো তুলতে পারবে ?

প্রশান্ত অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, এটা ত' আর বিজ্ঞান হল না,—এটা হল ম্যাজিক। বিজ্ঞানের সাহায্যে এই ম্যাজিক দেখানো কি সম্ভবপর ?

মিঃ ইন্‌ফিনিট বল্‌লেন, কেন নয় শুনি, মঙ্গল গ্রহে বিজ্ঞান অনেক কিছু ম্যাজিক দেখাতে সমর্থ হয়েছে। এই যে বিরাট বিশ্বে অসংখ্য সূর্য-গ্রহ-তারা কার অদৃশ্য সঙ্কেতে দিবারাত্র ঘুরপাক খাচ্ছে ভেবে দেখতে গেলে এটাও কি ম্যাজিক নয় ? আর আমরা জানি যে, বিজ্ঞানই এই অসাধ্য সাধন করেছে।

প্রশান্ত নির্বিকার ভাবে উত্তর দিলেন, মিঃ ইন্‌ফিনিট আপনি যা বল্‌ছেন--যদি সেটা সম্ভবপর করে তুলতে পারেন—তাহলে অতি সহজেই কাজ হাঁসিল করা চলবে। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, এই ভেলকি দেখানো সম্ভবপর হবে।

মিঃ ইন্‌ফিনিট বললেন এটাকে তুমি ভেলকিই বা ভাবছ কেন ? বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক অসম্ভবকে সম্ভবপর করা হয়েছে।

গভীর রাত্রে মিঃ ইন্‌ফিনিট পৃথিবীর তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্তকে গোপনে আরো কি কি পরামর্শ দিলেন, সে কথা আর জানা গেল না।

তবে পরের দিন থেকে প্রশান্ত নতুন ব্যবস্থাপনাতেই অতি গোপনে তার নিভৃত কাজ শুরু করে দিলেন। এমন কি তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুকেও প্রশান্ত তার কাজের ধারা প্রকাশ করলেন না।

এই ভাবে তার গোপন অভিযান দ্রুত বেগে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অক্সফোর্ড অঞ্চলের একটি মান-মন্দিরে গিয়ে কাজ চালু করবার সময় হঠাৎ প্রশান্তর হাত থেকে সেই প্লাগটা খুলে পড়ে যায়।

যে অধ্যাপক তাকে সঙ্গে করে মান-মন্দিরের ভেতরটা ব্যাখ্যা করে দেখাছিলেন তিনি হঠাৎ অবাক হয়ে বললেন, একি! আপনি ক্যামেরা নিয়ে মান-মন্দিরের অভ্যন্তরে ঢুকেছেন—একথা ত' আমায় আগে জানান নি। আপনার বিলক্ষণ জানা আছে যে, মান-মন্দিরের ভেতরে ঢুকে কোনো অংশের আলোক-চিত্র গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জেনে শুনে আপনি এ নিয়ম লঙ্ঘন কেন করলেন?

একটু চুপ করে থেকে অধ্যাপক ক্ষোভের সঙ্গে কইলেন, আপনি এই ব্যবহারের দ্বারা আমাকে শুদ্ধ অপ্রস্তুতে ফেলেছেন। এখন আমি কর্তৃপক্ষের কাছে কি সন্তোষ-জনক উত্তর প্রদান করবো— জানি না। এই জন্যেই ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা সাধারণতঃ বিশ্বাস করতে চাই নে।

এই জাতীয় আকস্মিক ঘটনা যে ঘটবে—প্রশান্ত তা আদপেই বুঝতে পারেন নি। সে জন্যে তিনি নিজেও কম অপ্রস্তুতে পড়েন নি।

তাই আমতা-আমতা করে উত্তর দিলেন, একেবারে ভুল হয়ে গেছে প্রফেসর। আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

কিন্তু চল্তি পথে বিঘ্ন উপস্থিত হলে ত সঙ্কল্প করা কাজ সম্পন্ন হবে না। যে করেই হোক—কাজ সমাধা করতে হবে।

তাই প্রশান্ত ইংলণ্ডে আর সময় নষ্ট না করে—বন্ধুদের কাছে বিদায় গ্রহণ করে ফ্রান্সের পথে রওনা হলেন।

তাঁর মনোবাসনা—ফ্রান্স, জার্মানী সুইজারল্যাণ্ড ও ইটালীর কাজ সমাধা করে—সোভিয়েট রাশিয়ায় উপনীত হবেন।

আগে থেকেই পূর্ব পরিচিতদের কাছে কিছু কিছু চিঠি লেখা ছিল। কাজেই এবার আর প্রশান্তর বেশী কোন অসুবিধা হল না।

প্যারিস শহরে ও আশে-পাশের কাজ শেষ করে প্রশান্ত সোজা জার্মানীতে গিয়ে হাজির হল।

জার্মানীতে তার কিছু বন্ধু-বান্ধব ছিল।

তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে প্রশান্ত দ্রুত বেগে তার কর্ম পরিক্রমা সুরু করে দিল।

এরই ফাঁকে ফাঁকে তার দেশ ভ্রমণের কাজও সম্পন্ন করতে হল।

এই কন্টিনেণ্ট ভ্রমণ কালে—নানা অঞ্চল দর্শন করে তাঁর মনে হল—এতগুলি যুদ্ধ মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা যে ভাবে বিজ্ঞানের জয় যাত্রা এগিয়ে নিয়েছেন—তাতে একথা বলা চলে যে, ভারত এখনো বহু পেছনে পড়ে রয়েছে।

কবে যে ভারতের বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের রথচক্রকে ঠিক ভাবে পরিচালনা করতে পারবেন সেটা সত্যি চিন্তার বিষয়।

একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, সুযোগ-সুবিধার অভাবে ভারতের বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রার্থিত উন্নতি দেখাতে পারছেন না। কিন্তু সেই সব বৈজ্ঞানিক যখন বিদেশে গিয়ে বিরাট কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে পারেন তখন তারা বহু ক্ষেত্রে অসাধ্য সাধন করেছেন। এ রকম বহু উদাহরণ এ পর্যন্ত বিদেশী ল্যাবোরেটরীতে পাওয়া গেছে। তখন সেই বৈজ্ঞানিকটি যে ভারতীয় সে কথা বলে আর গর্ব করা চলে না।

একথা ত' অস্বীকার করা চলে না—যে ভারত গরীব দেশ। সেই দেশের বৈজ্ঞানিকদের যত সাধ আছে তত সাধ্য নেই। কাজেই অপর দেশের বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার ও অগ্রগতির কাহিনী শুধু বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জার্ণালে পাঠ করেই তাদের তৃপ্ত থাকতে হয়। আসলে নিজেদের হাতে কলমে কাজ করবার সুযোগ ভারতীয় বৈজ্ঞানিক খুব কমই পেয়ে থাকেন।

প্রশান্ত যত এই সব দেশ পরিভ্রমণ করেন, বিজ্ঞানের অভিনব কর্মযজ্ঞ অবলোকন করেন,—ততই নিজের ওপর বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে।

কবে তারা পৃথিবীর যজ্ঞশালার সরিক হতে পারবেন? ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী ও ইটালী পরিভ্রমণ করে প্রশান্ত যখন ভিয়েনায় উপস্থিত হলেন—তখন তিনি অনেকটা ক্লান্ত।

খানিকটা নিরাশা কি তাঁর মনে জেগেছে?

মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিকের দ্বারা যদি পৃথিবীর বিজ্ঞান সাধনার কথা লিপি বদ্ধ হয়—তা হলে সেই গ্রন্থে ভারতের কথা কতটুকু স্থান পাবে?

এই কথা ভেবে প্রশান্ত যেন নিজের কাজে কোনো উৎসাহ খুঁজে পায় না।

সেইদিন গভীর রাত্রে মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিক মিঃ ইন্‌ফিনিট তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

মিঃ ইন্‌ফিনিট বলেন, তোমার কাজে একটা নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে এটা আমি অনুভব করতে পারছি।

প্রশান্ত খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, নিরাশার সঞ্চার হওয়া কি অহেতুক? আপনি নিজেই বিবেচনা করে বলুন না।

মিঃ ইন্‌ফিনিট তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, এই ক্ষণিক দৌর্বল্য তোমায় পরিহার করতে হবে। তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে আরো বহু

কাজ জমা হয়ে আছে। এখন যদি তুমি মধ্যপথে ঝিমিয়ে পড়ো, তা হলে সেই অর্ধ সমাপ্ত কাজ কে সমাধা করবে?

গ্রহ-উপগ্রহের চলার পথের দিকে তাকিয়ে দেখ—তাদের চলার পথে ছেদ নেই, বিরাম নেই। তারা যদি হঠাৎ খেয়াল খুশী মতো তাদের দৈনন্দিন পরিক্রমা বন্ধ করে দেয় তা হলে সৌর-জগতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে। অবশেষে সৌর-জগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। কোন বৈজ্ঞানিকই সেই দুর্দিন ঘনিয়ে আসুক—এই কামনা করে না। তুমি কেন ভারতের বৈজ্ঞানিক হিসেবে সহসা আদর্শচ্যুত হবে? আমরা চাই, আমাদের পরিকল্পনা আরো সুদূর প্রসারী হোক। মঙ্গল গ্রহের সহযোগিতায় পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকের দল অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলুক।

প্রশান্ত নীরবে মিঃ ইন্‌ফিনিটের কথাগুলি শুন্‌লেন বটে—কিন্তু হঠাৎ কোনো প্রতিবাদ করলেন না।

সত্যি কথা বল্‌তে কি,—বিরাট সৌর-জগতের কর্মকাণ্ডের কথা যখন চিন্তা করা যায়, তখন তুলনামূলক ভাবে ভারতের কথা ভাবলে মনে কোনো আশার সঞ্চার হয় না।

মিঃ ইন্‌ফিনিট তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্যে আবার বললেন, প্রশান্ত, আমি তোমায় আবার বলছি। হতাশ হয়ো না। তুমি এইবার সোভিয়েট রাশিয়া আর আমেরিকা পরিভ্রমণ শেষ করে নিজের ডেরায় ফিরে এসো। তখন আমি তোমার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় বসব।

প্রশান্ত মিঃ ইন্‌ফিনিটের উৎসাহবাক্যে বিশেষভাবে প্রেরণা লাভ করলেন কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু তিনি মনে মনে স্থির করলেন, যে দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তাকে অর্ধসমাপ্ত রেখে কিছুতেই দেশে ফিরে যাবেন না। তাহলে ভারতের বৈজ্ঞানিক হিসেবে তার সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে না।

সোভিয়েট রাশিয়া আর আমেরিকা পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে যখন

তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বিমান যাত্রা সুরু করলেন—তখন প্রশান্তর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল—সেটা বিশ্লেষণ করে বলা শক্ত।

তবু বহু উচ্চ আকাশে আরোহণ যখন তিনি উদ্দেশ্য হারা নীচের দিকে তাকিয়েছিলেন—, তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল—নীচে বহু নীচে পৃথিবীর বুকে সূর্যাস্ত ঘনিয়ে এসেছে।

রঙীন মেঘের খেলায় আকাশ এক বিচিত্র বর্ণের আলেখ্যে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে।

নীড় প্রয়াসী পাখীর দল সেই রঙীণ সমুদ্রে যেন সন্তরণ করতে করতে এগিয়ে চলেছে।

এই বিরাট বিশ্বে কোথায় প্রশান্তর স্থান ?

তাঁর জীবন-দেবতা তাকে দিয়ে কোন কাজ সাধন করবার জন্যে তাকে ধরাতলে নিয়ে এসেছেন, আর তাকে মনে মনে চিহ্নিত করে রেখেছেন—সে কথা তার জানা নেই।

পরম বিস্ময়ে সেই বিশ্বকর্মার কর্ম নৈপুণ্যের কথা ভেবে প্রশান্ত দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

॥ আট ॥

সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করে প্রশান্ত আবার নিজের নীড়ে ফিরে এলেন। শম্ভুদা এতদিন বাদে তাকে দেখতে পেয়ে যেন হারানো রতন খুঁজে পেল।

প্রশান্ত তাকিয়ে দেখেন, শম্ভুদা যেন আরো বুড়ো হয়ে গেছে। তার দেহটা যেন সত্যি নুয়ে পড়েছে।

প্রশান্ত যদিও দীর্ঘদিন ধরে ছুটোছুটি করেছেন—তবু তাকে দেখা

মাত্র বলা চলে যে, এই পৃথিবী পরিভ্রমণে তার স্বাস্থ্য আগের চাইতে ভালোই হয়েছে।

তার ফেরার খবর পেয়ে বন্ধু-বান্ধবেরা অনেকেই দেখা করতে এলেন।

বন্ধুদের আগ্রহের অন্ত নেই।

তারা ক্রমাগত জানতে চাইলেন, এত দীর্ঘকাল দেশভ্রমণ করে কোনো বিদেশী অভিজ্ঞতা লাভ করে ফিরে এসেছেন নাকি?

বন্ধুরা রসিকতা করে একথাও বললেন, আমরা ত ভাবলাম, তুমি বিদেশে বিয়ে করে সেখানেই বাড়ী-ঘর-দোর কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে।

আর একজন টিপ্পনি কাটলেন, দেশের প্রতি তোমার দরদ আছে একথা স্বীকার করতেই হবে। আবার সেই নীড়ের মায়ায় নিজের মাথা গোঁজবার ঠাঁইটিতেই ফিরে এলে।

কয়েকজন উৎসাহী বন্ধু জানতে চাইলেন, কোনো বিদেশী ডিগ্রী আহরণের জন্যেই সাত সমুদ্দুর তের নদী পাড়ি দিয়েছিল নাকি?

কিন্তু প্রশান্ত সবাইকে জানিয়ে দিলেন, যে নিছক দেশ ভ্রমণের জন্যেই তার এই পৃথিবী পরিক্রমা।

প্রশান্তর যে বৈজ্ঞানিক বন্ধুটি এতকাল তার ঘর-দোর রক্ষণাবেক্ষণ করছিলেন এবং তার ল্যাবোরেটরী ব্যবহার করছিলেন—তিনিও খুশীর সঙ্গে জানালেন যে, এখানে এসে তিনি তার আরব্ধ কাজ সুন্দর ভাবে সমাধা করতে পেরেছেন।

প্রশান্ত বললেন, যাক্, নিরিবিলি যায়গা পেয়ে তুমি যে তোমার কাজ শেষ করতে পেরেছ সেটা সত্যি আনন্দের কথা।

আসবার পর কয়েকটা দিন—আলাপ-আলোচনা-দেখাশোনা আর মার্কেটিং করতে কেটে গেল। প্রশান্ত বন্ধুদের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে যে সব উপহার এনেছিলেন তাও সবাইকে ঘুরে ঘুরে বিলিয়ে বেড়ালেন। সবাই উপহার পেয়ে ভারি খুশী।

একদিন গভীর রাত্রে মিঃ ইন্‌ফিনিট এসে দেখা দিলেন।

মৃদু হাস্যে বললেন, সবাইকে ত' উপহার বিতরণ করে বেড়াচ্ছ। এখন আমার জন্যে কি উপহার এনেছ,—সেই কথাই জানতে এসেছি।

প্রশান্ত মিঃ ইন্‌ফিনিটের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, আপনার উৎসাহেই ত' এই পৃথিবী পরিক্রমা। তা মোটামুটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলা চলে।

—তা'হলে সংগৃহীত ফটোগুলি এইবার আমার হাতে তুলে দাও।

মিঃ ইন্‌ফিনিট আগ্রহের সঙ্গে বললেন।

প্রশান্ত উত্তর দিলেন, তা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ফোটো নেহাৎ কম হয় নি। আপনার জন্যে সংগৃহীত সম্ভার আজ নিজে হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

মিঃ ইন্‌ফিনিট একান্ত কৌতূহলের সঙ্গে ফটোর খামটা তুলে নিলেন তারপর আকুল আগ্রহে উল্‌টে উল্‌টে দেখতে লাগলেন।

প্রতিটি ফটোর পেছনে প্রশান্ত নিজের হাতে পরিচয় লিপি লিখে রেখেছে। কাজেই কোন্‌ অঞ্চলের ফটো কোন্‌টা সেটা বুঝতে আর কোনো অসুবিধে নেই।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে আলোক-চিত্রগুলি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে মিঃ ইন্‌ফিনিট বললেন, তুমি বেশ ভালো ভাবেই নিজের কাজ সম্পন্ন করেছ। তোমার নিষ্ঠার প্রশংসা করতেই হবে। এখন একথা বলতে কোনো বাধা নেই যে, এই জরুরী কাজের জন্য আমি উপযুক্ত প্রতিনিধিই নির্বাচন করেছিলাম।

প্রশান্ত যদিও নিজের সংগৃহীত ফটোগুলির জন্য সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট নয়—তবুও মিঃ ইন্‌ফিনিটের এই প্রশংসা বাক্যে বেশ আত্মতুষ্টি লাভ করলেন।

তারপর কিছুক্ষণ ঘরে নীরবতা নেমে এলো। কেউ কোনো কথা

বলছেন না, কিন্তু উভয়ের মনেই নানা জাতীয় প্রশ্ন উঁকি মারতে লাগল।

আরো একটু বাদে মিঃ ইন্‌ফিনিট বললেন, প্রশান্ত, এইবার আমাদের আসল আলোচনায় আসা যাক্।

—আসল আলোচনা? সেটা আবার কি? প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলেন। মিঃ ইন্‌ফিনিট উত্তর দেন, তাহ'লে শোনো প্রশান্ত, এতদিন ধরে শুধু প্রস্তাবনাই চলছিল, এইবার আসল কাজ আরম্ভ করার আলোচনা।

—আসল কাজটা কি শুনি? ও বুঝতে পেরেছি পৃথিবী সম্পর্কে সেই গ্রন্থ রচনা?

মিঃ ইন্‌ফিনিট উত্তর দিলেন, গ্রন্থ রচনা তো সেই কর্ম-কাণ্ডের একটা সামান্য অংশ। আসল কাজ তারই পেছনে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে।

প্রশান্তও কম উৎসুক হয়ে ওঠে নি।

এইবার সে সরাসরি মঙ্গলের বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে শোনা যাক্—আপনার কর্ম-পরিকল্পনা—

মিঃ ইন্‌ফিনিটের মুখ ক্ষণকালের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, শোনো প্রশান্ত, তোমার মন দিয়ে সব কথা শোনা ও জানার প্রয়োজন আছে। কেননা, তোমার ওপরই সব কিছু নির্ভর করছে।

এইবার প্রশান্তর অবাক হবার পালা।

তিনি দুটি চোখ বড় বড় করে মিঃ ইন্‌ফিনিটের দিকে তাকিয়ে কৌতূহলের সুরে প্রশ্ন করলেন, আপনি ঝিনুক দিয়ে সাগর ছেঁচতে চান? নইলে মঙ্গল গ্রহে রাঘব-বোয়াল সব বৈজ্ঞানিক থাকতে আপনি পৃথিবীর এক নগণ্য মানুষের ওপর সব কিছু নির্ভর করে আছেন?

মিঃ ইন্‌ফিনিট এইবার উত্তর দিলেন, শোনো প্রশান্ত, পাঁয়তারা ত' অনেক হল। এইবার এসো, ভবিষ্যতের কর্মপন্থার একটা প্রস্তুতি নেয়া যাক।

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন মিঃ ইন্‌ফিনিট—প্রশান্তর দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আমার প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, তুমি ত' বিশ্বজয় করে অনেক কাজ সমাধা করে ফিরে এলে। এইবার পৃথিবীর তরুণ বৈজ্ঞানিক, তুমি মঙ্গল গ্রহে যাবার জন্যে প্রস্তুত হও। সেখানে তোমার জন্য অনেক দায়িত্ব, অনেক কর্তব্য সঞ্চিত হয়ে আছে।

প্রশান্ত মিঃ ইন্‌ফিনিটের দিকে অবিশ্বাসীর মতো তাকিয়ে বললেন, দেখুন, আপনি বেশ কিছুদিন পূর্বে আমাকে একবার মঙ্গল গ্রহে যাবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমি কি করে সুদূর সেই মঙ্গল গ্রহে রওনা হবো—ভেবে পাইনে। প্রথম কথা হচ্ছে, সেখানে যাবার কোনো বৈজ্ঞানিক ট্রেনিং আমি লাভ করিনি।

আমার দেহ সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ পটু কিনা আমি জানি না। আর তা ছাড়া মঙ্গল গ্রহে রওনা হবার যোগ্যতা আমার আছে কিনা সে সম্পর্কেও আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ওখানে আমার ওপর কি জাতীয় কাজের দায়িত্ব পড়বে, আর আমি সে কাজ সমাধা করতে পারবো কিনা আমি জানি না। এ ক্ষেত্রে আপনিই বলুন মিঃ ইন্‌ফিনিট, মঙ্গল গ্রহে রওনা হবার জন্য দেহে-মনে আমার প্রস্তুতি কোথায়?

মিঃ ইন্‌ফিনিট উত্তর দিলেন, প্রশান্ত তুমি উতলা হয়ো না। একে একে আমি তোমায় সব বুঝিয়ে দিচ্ছি—

আমি আগেই তোমায় জানিয়েছি যে, পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের মঙ্গল গ্রহের একটা স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হোক, এজন্যে আমরা দীর্ঘকাল ধরে একান্ত উৎসুক। সেইজন্যে আমাদের উড়ন্ত চাকী মাঝে মাঝে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। কিন্তু উপযুক্ত যোগাযোগের অভাবে আমরা এই কাজে বিশেষ অগ্রসর হতে পারিনি।

তারপর কি ভাবে তোমার সঙ্গে আমার একটা মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয় সে কথা আর বিশেষ ভাবে না বললেও চলবে।

আমরা এমন একজন তরুণ উৎসাহী কর্মী চেয়েছিলাম. যিনি

বিজ্ঞানকে ভালোবেসে পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের যোগাযোগ সাধনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসবেন।

আমি খবর নিয়ে জেনেছি, তোমার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। বিজ্ঞান চর্চার জন্যে তুমি এ পর্যন্ত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওনি। সকল দিক দিয়ে উৎসর্গিত প্রাণ তুমি। তোমার উৎসাহ, কর্মনিষ্ঠা আর উদ্দীপনা—মঙ্গলবাসীদেরও উৎসাহিত করে তুলেছে।

বিজ্ঞান চর্চায় আন্তরিকতা আর নিষ্ঠা আছে এমন তরুণ কর্মীই আমাদের কাম্য। সে দিক দিয়ে তুমি আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করেছ।

যে কাজের দায়িত্ব তোমায় দেওয়া হয়েছিল—অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে তুমি তা সম্পন্ন করেছ। এই কাজ আমাদের ভবিষ্যৎ গ্রন্থ সম্পাদনে বিশেষ সাহায্য করবে সন্দেহ নেই।

এইবার কথা হচ্ছে,—তুমি মঙ্গল গ্রহে যাবার উপযুক্ত দেহের অধিকারী কিনা। আমরা অলক্ষ্য থেকে পরীক্ষা করে দেখেছি যে তোমার দেহ দূর গ্রহে যাবার পক্ষে সম্পূর্ণ সক্ষম ও উপযুক্ত। তারপর উচ্চবিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য মঙ্গল গ্রহে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞগণ আছেন। আমি তাঁদের হাতে তোমায় ছেড়ে দেবো। আমার বিশ্বাস আছে, অযোগ্য পাত্রে আমি দায়িত্ব অর্পণ করছি না।

সুতরাং আমি তোমায় বলব, সর্বরকমে নিজেকে গ্রহান্তরে যাবার জন্য প্রস্তুত করো। মনে আর কোনো দ্বিধা রেখো না।

সামনে তোমার কর্মের প্লাবন আসছে। সেই কর্ম-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমায় মুক্তা সংগ্রহ করে আনতে হবে।

প্রশান্ত যখন মিঃ ইন্‌ফিনিটের উদ্দীপনাময় কথা শুনছিল তখন তাঁর মনে হয় সত্যি কথাই ত! শুধু পৃথিবীর বুকে আবদ্ধ থেকে তাঁর একক ক্ষুদ্র সামর্থ্যে কি করতে পারবে?

তার চাইতে মঙ্গলের এই উড়ন্ত চাকীতে চেপে গ্রহে-গ্রহান্তরে

উল্কার মতো ঘুরে বেড়ালে বিজ্ঞানের কত অজানা রহস্যকে জানতে পারবে। কত অচেনা বিজ্ঞান-সাধকের সঙ্গে পরিচয় হবে।

মিঃ ইন্‌ফিনিট তাঁর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলে—প্রশান্ত খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন।

এইবার তার নিজের দিকে তাকাবার সময় হয়েছে। তাঁর সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদল অনেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরী গ্রহণ করে জীবনে সংসারী হয়েছেন। বিয়ে করে নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেছেন।

আবার তাদের কোনো কোনো সতীর্থ বিদেশে গিয়ে বিজ্ঞান সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। সেই বিদেশ ভূমিকেই কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করে বাড়ী কিনে বিদেশী মেয়েকে বিয়ে করে সেই অঞ্চলেই সংসারী হয়ে পড়েছেন। তাদের দেশে ফিরে আসবার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। বিজ্ঞান সাধনায় তাদের যে দান—সেটা ত বিদেশের কাজেই নিয়োজিত হবে। মাতৃভূমি তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু আর প্রত্যাশা করবে বলে মনে হয় না।

প্রশান্তর হাতে যে সব কাজ জমা হয়েছিল সেগুলি একে একে সমাধা করতে হবে। কেননা, এই অসম্পূর্ণ কাজগুলির পেছনে প্রশান্তকে বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়েছে।

এখন সেই অসম্পূর্ণ কর্ম-সম্ভার তিনি যদি পরিত্যাগ করে চলে যান—তবে জীবনের বহু পরিশ্রম একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

প্রশান্ত তাই স্থির করলেন, আগে তার হাতের কাজগুলি সমাধা করতে হবে। তারপর তিনি শান্ত মনে ভেবে দেখবেন মিঃ ইন্‌ফিনিটের আহ্বানে গ্রহান্তরে যাবার ডাকে তিনি সাড়া দেবেন কিনা।

কিন্তু মিঃ ইন্‌ফিনিট আর অপেক্ষা করতে চান না।

মঙ্গল গ্রহে যে বিরাট কর্ম-যজ্ঞের সূচনা হয়েছে—তারই জন্য তিনি বার বার প্রশান্তকে আহ্বান জানাচ্ছেন।

প্রশান্ত জানেন না, পৃথিবীর এককোণের এক সাধারণ বৈজ্ঞানিক মঙ্গল গ্রহের বিরাট বিজ্ঞান সাধনাকে কিভাবে সাহায্য করবেন। আর কি তপস্যাতেই বা সেই বিজ্ঞান-যজ্ঞকে জয়যুক্ত করে তুলবেন।

একদিকে প্রশান্ত তার ল্যাবোরেটরীর অসম্পূর্ণ কাজ সমাধা করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন, অপরদিকে মিঃ ইন্‌ফিনিট সেই কাজের জন্য নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থেকে—প্রশান্তকে উড়ন্ত চাকীর আরোহী করবার জন্য সর্বরকমে তাকে ট্রেনিং দেবার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েছেন।

এই গোপনীয় কাজের জন্য মিঃ ইন্‌ফিনিটকে প্রায় প্রতিরাত্রেই প্রশান্তর ল্যাবোরেটরীতে আসতে হচ্ছে।

সাময়িক ভাবে মিঃ ইন্‌ফিনিট প্রশান্তর ল্যাবোরেটরীর একটা অংশকে মঙ্গল গ্রহের টেম্পারেচারে এনে—এই তরুণ বৈজ্ঞানিককে নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করে দিয়েছেন।

এ জন্যে প্রশান্তকে প্রত্যহ ব্যায়াম করতে হচ্ছে।

প্রশান্তর দেহের ওজন নিয়ে তাকে উড়ন্ত চাকীতে ভ্রমণ করবার উপযোগী করে নানাপন্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হচ্ছে।

প্রশান্তর প্রাত্যাহিক খাদ্যের কথা ভাবতে হচ্ছে।

পৃথিবীর বুকে প্রশান্ত সাধারণতঃ যে সব খাদ্য গ্রহণ করে থাকেন—উড়ন্ত চাকীর অভ্যন্তরে তা আদৌ চলবে না।

কাজেই বিকল্প ব্যবস্থা করে নিতে হবে—তার বেঁচে থাকবার জন্য।

উড়ন্ত চাকীতে থাকা কালে প্রশান্ত কতটা উত্তাপ সহ্য করতে পারবেন সেটাও দেখতে হবে।

যাতে তাঁর দেহের উত্তাপের সঙ্গে উড়ন্ত চাকীর অভ্যন্তরের উত্তাপ সমতা রক্ষা করতে পারে,—অনুশীলন করে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রত্যহ গভীর রাত্রে এই সব কাজের শিক্ষাদান পর্ব মিঃ ইন্‌ফিনিট কৌশলে চালিয়ে যাচ্ছেন।

যেভাবে প্রশান্তকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে,—তার আবার প্রাত্যাহিক বিবরণী বেতার যোগে মঙ্গল গ্রহে প্রেরিত হচ্ছে।

ওখানকার বিশেষজ্ঞেরা সে সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত মিঃ ইন্‌ফিনিটকে জানিয়ে দিচ্ছেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ট্রেনিং-এর পন্থাও পরিবর্তন করতে উপদেশ দিচ্ছেন।

কাজেই এ সব ব্যাপারে প্রশান্তর ওপর কাজের চাপ পড়েছে অনেক বেশী।

দিনের বেলা তাঁকে অসমাপ্ত কাজ নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

আবার গভীর রাত্রে মিঃ ইন্‌ফিনিটের কাছ থেকে তাঁকে ট্রেনিং নিতে হচ্ছে।

অবশ্য মিঃ ইন্‌ফিনিট জানিয়েছেন, এ জন্যে তার শরীর মোটেই ক্লান্ত হবে না। বরঞ্চ মঙ্গল গ্রহের বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাপনায় প্রশান্তর দেহের উন্নতিই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কাজ করলেও ক্লান্ত হয়ে না পড়া মঙ্গল গ্রহের শিক্ষাপদ্ধতির একটা বৈশিষ্ট্য।

প্রশান্ত এখন বেশ বুঝতে পারছেন যে, বিজ্ঞানের সাহায্যে মঙ্গলের অধিবাসী দৈনন্দিন কাজে কতটা উন্নতি লাভ করতে পেরেছেন। শুধু তাই নয়,—নতুন ধরণের ভেষজের সাহায্যে মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিক গ্রহবাসীর জীবনীশক্তি প্রয়োজনমত বাড়িয়ে দিতে পারেন।

আমাদের প্রাচীন ভারতের ঋষিদের আয়ুর্বেদ ও বিজ্ঞান সাধনার কথা প্রশান্তর মনে জাগে।

ভারতের কায়কল্প চিকিৎসা, কিম্বা চ্যবন মুনির চ্যবন প্রাশ রসায়ন তৈরী করে যৌবনকে অক্ষয় করবার ব্রতের কথা প্রশান্তর জানা আছে।

এছাড়া মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, রাজা যযাতি তাঁর পুত্রের যৌবন গ্রহণ করে দীর্ঘকাল রাজত্ব পরিচালনা করেছিলেন।

মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিক ভারতের সেই লুপ্ত বিজ্ঞান সাধনা সঞ্জীবিত করে কি নব-যজ্ঞে আহুতি প্রদান করতে উদ্যত হয়েছে?

গ্রহ-তারকার যোগাযোগ মিলিয়ে, রাশিচক্র অনুধাবন করে মিঃ ইনফিনিট্ স্থির করেছেন, যখন মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর কাছাকাছি আসবে—সেই নির্ধারিত সময়ে প্রশান্তকে নিয়ে উড়ন্ত চাকীতে উঠে দীর্ঘ পথের পাড়ি জমাবেন।

ইতিমধ্যে প্রশান্তও নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছেন। অনেক পরিশ্রম করে অসম্পূর্ণ কাজগুলি শেষ করে ফেলেছেন।

এমন কতকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল—সেগুলি সমাধা হতে দীর্ঘ সময় লাগবে—তার দায়িত্ব কয়েকজন বন্ধুর হাতে ছেড়ে দিয়েছেন।

তাঁকে পৃথিবী ছেড়ে গ্রহান্তরে যেতে হচ্ছে।

আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসতে পারবেন কিনা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত কথা।

হয়ত এমনও হতে পারে যে, মঙ্গল গ্রহে গিয়ে তার শরীর টিকল না। সেই দূর দেশেই তাকে দেহত্যাগ করতে হল।

সে জন্যে সবকিছু বিলি-ব্যবস্থা তাকে করে যেতে হবে। তাঁর ল্যাবরেটরীর দায়িত্ব তিনি আগের মতো এক বৈজ্ঞানিক বন্ধুর হাতে সমর্পণ করলেন।

শম্ভুদা বর্তমানে এইখানেই থাকবে—তারপর যতদিন তার শরীর বয়।

তার ভরণ-পোষণের জন্য প্রশান্ত আলাদা টাকা ব্যাঙ্কের হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন। যাতে সে প্রয়োজনমত টাকা তুলতে পারে—এজেন্টের সঙ্গে দেখা করে সে ব্যবস্থাও করে গেলেন।

সত্য বটে বর্তমানে প্রশান্তর আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই।

কিন্তু একটা পৈত্রিক ভিটে ত আছে!

সেখানে আজও অযত্নে পড়ে থাকা বাড়ী আছে। ঠাকুর-দালান আছে। আর আছে পূর্বপুরুষের তৈরী শিবমন্দির, আর পুষ্করিণী।

ছেলেবেলায় ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনেছেন, আগেকার দিনে কত ধূমধাম করে এই ঠাকুর-দালানে দোল-দুর্গোৎসব, বাসন্তী পূজো সম্পন্ন হত। ঢাক-ঢোল-সানাই বাজত। কত লোক এসে প্রসাদ গ্রহণ করত। আজ সে সব গল্প। একেবারে রূপকথা হয়ে গেছে। প্রশান্ত স্থির করলেন, গ্রহান্তরে যাবার আগে শেষবারের মত সেই জন্মভূমি, আর পিতৃ-পুরুষের ভিটে দর্শন করে যাবেন।

প্রশান্ত অবশেষে সত্যি-সত্যি একদিন তার জন্মস্থান হুগলীর অন্তর্গত একটি গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

মূল দালানটা আজও আছে। কিন্তু তার চারদিক জঙ্গলে একেবারে ছেয়ে গেছে। উঠোনে আশ স্যাঁওড়া আর ভাটের বন হয়েছে। তার ছেলেবেলায় তাদের প্রাঙ্গণে একটি কামিনী ফুলের গাছ, আর একটি শিউলী গাছ ছিল। তাতে শরৎকালে অজস্র ফুল ফুটত।

সেই গাছ দুটো নানা জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যে আত্মগোপন করেছে,—তাদের আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

শিবমন্দিরের সেবাইতের বংশধর একজন ওদের ভিটেতেই এখনো বাস করছেন। তাঁরও যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। তিনি কোনো রকমে একটি পায়ে-চলা-পথ করে নিয়েছেন। সেই পথেই যাতায়াত চলে। শিবমন্দিরের পাশের পুকুরটি আজও হেজে-মজে যায়নি। ওর জলটি আজও টলটলে আছে। গাঁয়ের অনেক বৌ-ঝিরা সেই পুকুর থেকে এখনো কলসী ভর্ত্তি করে জল নিয়ে যায়।

শিবমন্দিরের সেবায়েৎ তাঁর পরিচয় পেয়ে অনেক দুঃখ করলেন। জানালেন, প্রশান্ত যদি তাঁকে কিছু কিছু করে অর্থ সাহায্য করতেন তাহলে তার পৈতৃক ভিটেকে জঙ্গল মুক্ত করে রাখতে পারতেন।

কিন্তু সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ত' তার ঠিকানা জানেন না, তাই বহু চেষ্টা করেও তাকে কোনো খবর দিতে পারেন নি।

এত দুঃখের মধ্যেও সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিন্তু শিবমন্দিরের নিত্যপূজা বন্ধ করেন নি। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় সেই নির্জন শিবমন্দিরে এখনো প্রদীপ জ্বলে।

প্রশান্ত বেশ বুঝতে পারলেন—তাঁর জন্মভূমি—সেই পৈতৃক ভিটের কোনো খবর না রেখে—সত্যি অন্যায় কাজ করেছেন। প্রশান্ত সেই শিবমন্দিরের সেবাইয়ের হাতে কিছু অর্থ দিয়ে নিজের আচরণের জন্যে ত্রুটি স্বীকার করলেন।

তারপর একদিন একান্ত সঙ্গোপণে তাঁর জন্মভিটা থেকে কিছু মাটি সংগ্রহ করে চোরের মতো সেখান থেকে পালিয়ে এলেন।

দ্বিতীয়বার আর সেদিকে পেছন ফিরে তাকাতে পারলেন না। আজ এতদিন পরে তাঁর জন্মভূমির জন্য কেন যে দুটি চোখ জলে ভরে এলো—সে কথাও তিনি ভালো করে বুঝে উঠতে পারলেন না।

আবার এই জন্মভিটায় কোনো দিন ফিরে আসতে পারবেন কিনা প্রশান্তর তা জানা নেই!

ল্যাবোরেটরীতে ফিরে এসে প্রশান্ত তার ক্ষণিক দৌর্বল্য মন থেকে মুছে ফেলে দিলেন।

ইতিমধ্যে মিঃ ইন্‌ফিনিট তার সঙ্গে দেখা করে জানালেন, রওনা হবার শুভ মুহূর্ত্ত এগিয়ে এসেছে। এইবার তাকে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে সুদূর মঙ্গল গ্রহে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

প্রশান্তও সকল রকমে প্রস্তুত। আর তার মনে কোনো দ্বিধা নেই। বিজ্ঞান সাধনার জন্য যখন তিনি একবার মনস্থির করে ফেলেছেন তখন আর তিনি সে পথ থেকে ভ্রষ্ট হবেন না।

বাইরের লোকজন যাতে দেখতে কিম্বা বুঝতে না পারে সেইজন্য মিঃ ইন্‌ফিনিট স্থির করেছেন, গভীর রাত্রে তাঁরা রওনা হবেন।

সময় মত সংবাদ পেয়ে মঙ্গল গ্রহের উড়ন্ত চাকী এসে উপস্থিত।

মহাকাশ পরিভ্রমণে যাত্রীকে নাইনল নির্মিত সর্বপ্রকার চাপসহ বিশেষ ধরণের পোষাক পরিধান করতে হয়। প্রচণ্ড তাপ থেকে যাত্রীকে রক্ষা করবার জন্য এই বিশেষ ধরণের পোষাক অ্যালুমিনিয়াম চাদরে জোড়া থাকে। যাত্রীর দেহের বিভিন্ন অংশের শরীরতত্ত্ব ঘটিত সংবেদন" লক্ষ্য করবার জন্য পোষাকটিতে প্রায় দুই ডজন বৈদ্যুতিক সংযোগ যুক্ত থাকে।

মিঃ ইন্‌ফিনিট প্রশান্তকে সেই সাজে সজ্জিত করে মঙ্গল গ্রহের বিশেষ বর্ম আবরণে আবৃত করে দিলেন।

তারপর প্রশান্তর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্যে বল্‌লেন, ভয় পাবার কিছু নেই। মঙ্গল গ্রহের নিরপত্তা ব্যবস্থা এত দৃঢ় যে, আমাদের শঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই।

উড়ন্ত চাকী তাদের নিয়ে দ্রুত বেগে অগ্রসর হল এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের অঞ্চল ছাড়িয়ে মহাশূন্যের দিকে নক্ষত্রবেগে অগ্রসর হল। মাধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্ত হতেই প্রশান্তর দেহ উড়ন্ত চাকীর ভেতর বেলুনের মত ভাসতে লাগল। এই ভাবে ভারমুক্ত হওয়াতেও ভয় পাবার কোন কারণ ছিল না।

মিঃ ইন্‌ফিনিট প্রশান্তকে শ্যাওলার তৈরী এক প্রকার ট্যাব্‌লেট খাইয়ে দিলেন। এই ব্যবস্থায় তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা একেবারে দূর হয়ে গেল।

মহাশূন্যে কি দ্রুত গতিতে উড়ন্ত চাকীটা অগ্রসর হচ্ছে—সেটা দেখবার জন্য এক প্রকার বিশেষ জানালা আছে। প্রশান্ত দেখলেন—মহাশূন্যে গ্রহ-নক্ষত্র ছাড়িয়ে মেঘলোক পেরিয়ে তাদের উড়ন্ত চাকী উল্‌কার বেগে অগ্রসর হচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখবার কোনো সম্ভাবনা প্রশান্তর ছিল না।

কিন্তু মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে সেই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে প্রশান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেল।

মিঃ ইনফিনিট বললেন, মাঝে মাঝে মঙ্গল গ্রহ থেকে যে বার্ত্তা

আসছে, সেটা বোধ হয় তুমি বুঝতে পারছ না। কিন্তু তুমি সে ভাষা এখন বুঝতে পারবে না। কারণ সে ভাষা ত' তুমি এখনো শেখনি। তবে মঙ্গল গ্রহে পৌঁছে তুমি ভাষাবিদ্‌দের কাছ থেকে অতি সহজেই আমাদের ভাষা শিখে নিতে পারবে। তখন আর তোমার কোনো অসুবিধেই হবে না।

উড়ন্ত চাকীর অভ্যন্তর ভাগ এমন ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে মানুষেরও কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

প্রশান্ত মনে ভেবেছিল, উড়ন্ত চাকীর ভেতরে গিয়ে না জানি কি সব অসুবিধার সম্মুখীন হবে। কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে সব কিছু দূরীভূত হয়ে গেছে।

এক সময় মিঃ ইন্‌ফিনিট বললেন, আমরা পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দিকে অর্ধেক পথ চলে এসেছি। আর বাকি পথটা যেতে পারলেই নিরাপদে মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করতে পারবো।

কিন্তু সৌর-জগতের রহস্য আগে থেকে কে অনুমান করতে পারে ?

হঠাৎ মিঃ ইন্‌ফিনিট একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

—তাইত! এযে মহা ভাবনার কথা হল।

প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ ইন্‌ফিনিট, আপনি এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন ? কোনো বিপদের সম্ভাবনা হয়েছে কি ?

মিঃ ইন্‌ফিনিট দূরবীণ দিয়ে মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি আমরা—

প্রশান্ত প্রশ্ন করলেন, কি সে সমস্যা, আমি জানতে পারি কি ? মিঃ ইন্‌ফিনিট বললেন, দেখতে পাচ্ছি—হঠাৎ একটা উল্‌কা কক্ষচ্যুত হয়ে আমাদের উড়ন্ত চাকীর দিকে এগিয়ে আসছে—

প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে কি এই উড়ন্ত চাকী শূন্য পথেই একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে ?

মিঃ ইন্‌ফিনিট উত্তর দিলেন, আমরা এই বিঘ্নের কথা মঙ্গল

গ্রহের মানমন্দিরে জানিয়েছি—; সঙ্গে সঙ্গে তারা জবাব দিয়েছেন, আমাদের কক্ষ পথ কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করতে হবে। উল্‌কাটার আকৃতিও বড় কম নয়—

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ইন্‌ফিনিট প্রশান্তকে দূরবীণের সাহায্যে সেই উল্‌কাটা দেখিয়ে দিলেন।

বিপদ যখন সত্যি ঘনিয়ে এলো, মিঃ ইন্‌ফিনিট কিন্তু মোটেই বিচলিত হলেন না।

যথা সময়ে উড়ন্ত চাকীর গতি পথ তিনি পরিবর্তন করে দিলেন। তারই ফলে সেই উল্‌কার সঙ্গে আর কোনো সংঘর্ষ হল না।

এরপর তাদের আর কোনো বিপদের সামনে পড়তে হয় নি। যথা সময়ে উড়ন্ত চাকী এসে মঙ্গল গ্রহের ভূমি স্পর্শ করল।

মঙ্গল গ্রহের পক্ষ থেকে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাবিদ্ আকাশ-বন্দরে প্রশান্তকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন।

মুখপাত্রটি জানালেন যে, পৃথিবী থেকে তিনিই প্রথম এই মঙ্গল গ্রহে পদার্পণ করলেন। সে হিসাবে তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে এক নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি করলেন।

মিঃ ইন্‌ফিনিট এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানিয়ে দিলেন, কি ভাবে পৃথিবীর তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রশান্তর সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে সেই পরিচয়ই ঘনিষ্ঠতার রূপলাভ করে।

পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকের-সঙ্গে মঙ্গলের বৈজ্ঞানিকের যোগাযোগের ফলে— অদূর ভবিষ্যতে এক নূতন কর্মকাণ্ড এবং এক নূতন জগতের উদ্ভব হবে। সারা বিশ্ব গ্রহ-উপগ্রহ সেই নব রচনা বিস্ময়ের সঙ্গে নিরীক্ষণ করবে।

প্রথম দিন বিশ্রাম গ্রহণের পর—দ্বিতীয় দিন মিঃ ইন্‌ফিনিট প্রশান্তকে নিয়ে মঙ্গল গ্রহ পরিভ্রমণে বহির্গত হলেন।

মঙ্গলের আকাশে ভ্রমণ করবার জন্যে এক বিশেষ ধরণের বিমান

আছে। তাতে আরোহণ করেই তারা মঙ্গলের দৃশ্যাবলী অবলোকন করতে করতে অগ্রসর হলেন।

কথা-প্রসঙ্গে মিঃ ইন্ফিনিট প্রশান্তকে জানালেন, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে মঙ্গল গ্রহের উপরিভাগ অনেকটা চন্দ্রের মতোই অনুর্বর ও কঙ্করময় ছিল।

কিন্তু মঙ্গলের অধিবাসীরা তাদের পরিশ্রম, নিয়মনিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বড় বড় দীর্ঘ খাল খনন করে। পৃথিবীর মতোই মঙ্গল গ্রহের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে প্রচুর বরফ জমে থাকে। বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই বরফকে গলিয়ে এই সব খালে প্রবাহিত করা হয়। তারই ফলে মঙ্গল গ্রহে এখন আর জলের অভাব নেই।

মঙ্গল গ্রহের যা কিছু প্রয়োজন—এই খালের জলের সাহায্যেই পূরণ করা হয়েছে।

ধীরে ধীরে মঙ্গল গ্রহ শস্য-শ্যামলা হয়ে ওঠে।

তারই ফলে মঙ্গলের বুকে প্রচুর খাদ্য-শস্য ফলে।

এই ভাবে বেশ কিছুদিন চলে।

কিন্তু মঙ্গলের বৈজ্ঞানিক দল—এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারা বহু বর্ষ ব্যাপী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এই গ্রহের অধিবাসীদের খাদ্য সমস্যার সমাধান করেছেন।

এখন আর মঙ্গলের বুকে ফসল ফলিয়ে খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না।

বৈজ্ঞানিকেরা এক ধরণের ট্যাবলেট তৈরী করেছেন। তারই সাহায্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব দূর করা যেতে পারে।

বর্তমানে মঙ্গল গ্রহ পরিচালিত হয় বিভিন্ন বর্ণের আলোক-নিয়ন্ত্রণে।

নানাবর্ণের আলোক নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কার্য সমাধা করা হয়। শুধু তাই নয়,—এই আলোক-নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই অধিবাসীদের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানো হয়।

মঙ্গল গ্রহের বুকে যদি ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাত নেমে আসে তা হলে আগে থেকেই বৈজ্ঞানিকগণ সচেতন হন।

তাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সাহায্যে আশু বিপদের কথা জানতে পেরে বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন অঞ্চলে আলোক-নিয়ন্ত্রণের কাজে তৎপর হয়ে ওঠেন। সেই আলোকের বিকীরণে আর বিচ্ছুরণে মঙ্গলগ্রহের মাথার ওপর থেকে ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় দূরীভূত হয়ে যায়।

আবার যদি কোনো কারণে অগ্নুৎপাত হয়—তা হলেও আলোক নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে সেই আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। একে বলা যেতে পারে বিষে বিষক্ষয়।

মঙ্গল গ্রহে অতিবৃষ্টি কিম্বা অনাবৃষ্টি হলেও আমাদের সুদক্ষ বৈজ্ঞানিকের দল আলোক নিয়ন্ত্রণ করে সেই সমস্যার সমাধান করে থাকেন।

তারপর একটু নীরব থেকে মিঃ ইন্‌ফিনিট বললেন, তোমাকে ধীরে ধীরে এই সব বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল শিক্ষা দেয়া হবে। যাতে পৃথিবীর বুকেও একদিন তোমরা এই প্রথা চালু করতে পারবে।

মিঃ ইন্‌ফিনিট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রশান্তকে মঙ্গল গ্রহের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখাচ্ছিলেন! মঙ্গল গ্রহে মানুষের তৈরী সরোবর, ঝরণা, রাস্তাঘাট, নানা জাতীয় সেতু, সন্তরণের পুষ্করিণী, ফোটা ফুলের উদ্যান, মাইলের পর মাইল ব্যাপী বনাণী ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে আছে।

আগে মঙ্গল গ্রহের ওপর এখানে-ওখানে ছোট-ছোট টিলা বা পাহাড় ছিল।

কিন্তু মঙ্গলের অধিবাসীরা তাদের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের কৌশলে বিরাট বিরাট পর্বতের সৃষ্টি করেছেন। সেই সব পর্বতের শিখর-দেশে সুরম্য অট্টালিকা শোভা পাচ্ছে। কোনো কোনো পর্বত শিখরে সুউচ্চ মানমন্দির রয়েছে। এখান থাকেজ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সৌর-জগতের

গ্রহ-নক্ষত্র-উপগ্রহ ধূমকেতু উল্কা প্রভৃতির গতিপথ নিরীক্ষণ করে যথারীতি লিপিবদ্ধ করে থাকেন।

খানিকবাদে দেখা গেল—মঙ্গলগ্রহের বিমানটি অনেক নীচে নেমে এসেছে। এর ফলে মঙ্গল গ্রহের ভূ-পৃষ্ঠ ভালো করে দেখার সুযোগ হবে।

মিঃ ইন্‌ফিনিট জানালেন, আমাদের মঙ্গল গ্রহের শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য কোনো বিরাট হর্মরাজি কিম্বা বিশ্ববিত্যালয়ের প্রয়োজন হয় না। সারা দেশ জুড়ে কৃত্রিম শিশু উদ্যান রচনা করা হয়েছে। এই উদ্যানগুলির ছায়াশীতল পরিবেশে ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞান-সাহিত্য-অর্থনীতি সব কিছু শিক্ষা লাভ করে থাকে। অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকেরা তাদের দেহের পুষ্টি সাধনের জন্য রকমারী ট্যাবলেট তৈরী করে থাকেন। বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রকমের ট্যাবলেট তাদের খাওয়ানো হয়। তারই ফলে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্যবান হয়ে গড়ে ওঠে। তাদের মস্তিষ্কও যথাযথ ভাবে তৈরী করা হয়। যদি কোনো ছেলে বা মেয়ের দেহ সুগঠিত না হয় তা হলে আলোক নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে সেই অপুষ্টি দূর করা হয়।

তোমায় আলোক নিয়ন্ত্রণের কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে সেই আলোক-নিয়ন্ত্রণ প্রথা শিক্ষা লাভ করতে হয়।

গ্রহের পরিচালনা ও নিরাপত্তার জন্য এই আলোক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে অবশ্য পাঠ্য হিসেবে শিক্ষালাভ করতে হয়।

॥ দশ ॥

এইবার প্রশান্তর শিক্ষালাভ শুরু হল।

প্রথমে শিক্ষাবিদ্‌দের কাছে ভাষার পাঠ গ্রহণ।

সমগ্র মঙ্গল গ্রহে একই ভাষার প্রচলন রয়েছে!

তাতে কার্য পরিচালনার ব্যাপারে ভারি সুবিধে।

আর সে ভাষাও দ্রুত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে।

অনেকটা সর্টহ্যাণ্ড ধরণের।

সুতরাং মঙ্গল গ্রহে ভাষা শিক্ষা করতে বেশী বেগ পেতে হয় না। ধ্বনির ওপর নির্ভর করে এই ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।

কয়েকদিন চেষ্টার পর এই ভাষা অতি সহজেই আয়ত্ত করা যায়।

ভাষার পরই আলোক নিয়ন্ত্রণ শিক্ষালাভ করতে হয়।

মঙ্গল গ্রহে এই আলোক-নিয়ন্ত্রণের ওপরই সব কিছু নির্ভর করে। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনী ইত্যাদি, তারপর তাদের অজস্র মিশ্র রঙ আছে। যার সাহায্যে এই মঙ্গল গ্রহে সমস্ত কিছু কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়।

এক কথায় বলা যেতে পারে—এই আলোর সাহায্যেই মঙ্গল গ্রহে ধ্বংস আর সৃষ্টির কাজ অব্যাহত থাকে।

বিজ্ঞানের এ এক বিচিত্র ক্রীড়া পদ্ধতি।

প্রশান্তকে এই আলোক-নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা করতে বেশ সময় ব্যয় করতে হল। সুকঠিন অঙ্কের মাধ্যমে এই আলোক-নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সেজন্যে সূক্ষ্ম বিচার ও অসামান্য ধৈর্যের প্রয়োজন হয়।

এই সূক্ষ্ম বিচার যথাযথ না হলে কোনো প্রার্থিত কাজে সাফল্য লাভ করা যায় না।

কঠিন পরিশ্রম করে প্রশান্তকে এই সূক্ষ্ম বিচার আয়ত্ত করতে হল।

ইতিমধ্যে মঙ্গল গ্রহের সেরা বৈজ্ঞানিকগণ একদিন তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে পৃথিবী সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে চাইলেন।

বৈজ্ঞানিকগণ তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করলেন।

তাঁরা যা বললেন তার সারাংশ হচ্ছে, এই যে বর্তমানে মঙ্গল গ্রহের আর কোনো সমস্যা নেই। শুধু এই গ্রহে স্থানের একান্ত অভাব।

সুতরাং অবিলম্বে অপর কোনো গ্রহে যদি মঙ্গলের বৈজ্ঞানিকবৃন্দ স্থান সংগ্রহ করতে না পারেন, তবে তাদের অধিবাসীরা অন্তর্বিপ্লবে মেতে উঠবে। ফলে এই মঙ্গল গ্রহ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিকেরা বহু চেষ্টা করে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক প্রশান্তকে এই গ্রহে নিয়ে এসেছেন—শুধু এই পরম আশ্বাসে যে প্রশান্ত তাদের পৃথিবীর বুকে উপনিবেশ স্থাপনে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করবেন।

মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিকেরা একথাও তাঁকে জানালেন যে, অপর কোনো গ্রহে বা উপগ্রহে উপনিবেশ স্থাপনে তাদের বহু অসুবিধা আছে। একমাত্র পৃথিবীই হচ্ছে তাদের পক্ষে উপযুক্ত স্থান। এই পরিকল্পনায় প্রশান্তকে তাদের সর্বরকমে সহযোগিতা করতে হবে। প্রতিদান হিসেবে প্রশান্ত হবেন—পৃথিবীর বুকে মঙ্গল গ্রহের চীফ অরগানাইজার। এ ছাড়া বিজ্ঞান প্রদত্ত সকল রকম সুখ-সুবিধা তিনি অবলীলা ক্রমে ভোগ করবেন।

মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিকগণের এই প্রস্তাব শুনে প্রশান্ত একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেলেন !

তিনি না পারলেন এই প্রস্তাব সম্পর্কে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করতে, আর না পারলেন—এই বিষয়ের বিরুদ্ধে মতামত জানিয়ে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে।

তাঁর মাথায় যেন একেবারে বাজ ভেঙে পড়ল !

ইতিমধ্যে মিঃ ইন্‌ফিনিট একটি সচিত্র পুস্তক এনে তাঁকে দেখালেন। তাঁর অনুরোধে প্রশান্ত পৃথিবীর বুকের যে সব মান-মন্দিরের আলেখ্য সংগ্রহ করেছিলেন,—এই গ্রন্থে সেই সব চিত্র বিভিন্ন দেশ হিসেবে সুবিন্যস্ত করে সাজিয়ে মুদ্রিত করা হয়েছে। কোন্ রাষ্ট্রে কত মানমন্দির তার সংখ্যানুপাত ও বিশেষ হিসেব করে দেখানো হয়েছে।

সেই দিন গভীর রজনীতে প্রশান্ত একা একা চিন্তা করতে

লাগলেন। বিশেষ করে এই সচিত্র গ্রন্থখানি তাকে দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে—প্রশান্ত যদি তাদের প্রস্তাবে সহজ ভাবে সম্মত না হয় তবে মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিকেরা আলোক নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে পৃথিবীর বুকের এই সমস্ত মানমন্দির ভস্মীভূত করে ফেলবে।

আজ প্রশান্ত বুঝতে পারলেন কি কুক্ষণেই এই মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল।

প্রশান্তকে পৃথিবী থেকে বহুদূরে এনে এই মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিকেরা তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে বন্দী করে ফেলেছে।

এখন যদি প্রশান্ত তাদের পরিকল্পনায় বিন্দুমাত্র আপত্তি জানায় তা হলে কিছুতেই সে আর পৃথিবীর বুকে ফিরে যেতে পারবে না।

আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে প্রশান্ত।

বিজ্ঞান যেমন মানুষের হিত সাধন করতে পারে, তেমনি স্বার্থপর আর অর্থ পিশাচ বৈজ্ঞানিকের হাতে পড়লে—সেই বিজ্ঞান-সাধনা মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়।

মঙ্গলের বৈজ্ঞানিকদল এখন শুধু অপর গ্রহ জয় করার লালসাতেই উন্মাদ হয়ে উঠেছে। এখন কোনো হিতোপদেশের বাণীই সে গ্রহণ করবে না। সব কিছুই তার কাছে তিক্ত বলে অনুভূত হবে।

কাজেই প্রশান্ত স্থির করলো, ওদের প্রস্তাবে আপত্তি উত্থাপন করা চলবে না। বরঞ্চ ওদের কথায় সায় দেয়া ছাড়া ওর আর কোনো উপায় নেই!

ইতিমধ্যে মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে সব রকম কলা-কৌশল আয়ত্ত করে নিতে হবে। যাতে সময় উপস্থিত হলে এবং সুযোগ এলে সে পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্য এদের সমস্ত পরিকল্পনার ওপর চরম আঘাত হানতে পারে।

ইতিমধ্যে মিঃ ইন্‌ফিনিটের বার বার এসে প্রশান্তকে উদ্দীপ্ত করে তোলার কাজে এতটুকু শৈথিল্য নেই।

আর এক অবসরে মিঃ ইন্‌ফিনিট এসে ওকে বোঝালেন, শোনো প্রশান্ত, আপাত দৃষ্টিতে তোমার মনে হতে পারে তুমি পৃথিবীর ক্ষতি করছ। পৃথিবীর ক্ষতি তুমি করবে কি করে?

কিন্তু একটুখানি তলিয়ে দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে, পৃথিবীর অধিবাসীদের কোনো ক্ষতি তাতে হবে না।

বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীর যে অচিন্ত্যনীয় পরিবর্তন হবে তাতে শুধু মুষ্টিমেয় মঙ্গলবাসীই স্থান পাবে না, পৃথিবীর অসংখ্য অধিবাসী তার সুখ সৌভাগ্য এবং উন্নতির সব কিছু উপচার ভোগ করবে। প্রথমেই ভেবে দেখ, পৃথিবীর বিরাট খাদ্যাভাব সমস্যা একেবারে দূরীভূত হয়ে যাবে। মঙ্গল গ্রহ যেভাবে খাদ্য সমস্যার সমাধান করেছে তার সব কিছু সুযোগ-সুবিধা তোমাদের পৃথিবীর অধিবাসীরা ভোগ করতে পারবে।

বিজ্ঞানের নব নব কলাকৌশলের সাহায্যে পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে আর বেকার সমস্যা থাকবে না। সবাই পরিশ্রম করে বেঁচে থাক্‌বার অধিকার লাভ করবে। আর কে বলতে পারে তোমাদের পৃথিবীর অধিবাসীদের ভেতর থেকেই আগামী দিনে আরো প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক আত্মপ্রকাশ করবে কিনা।

কাজেই—আমি বলব, তুমি এই সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে—পৃথিবীর মানুষদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনই করছ।

কাজেই পৃথিবীর একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক রূপে তোমার মনে কোনো দ্বিধা বা সঙ্কোচ থাকা উচিত নয়।

প্রশান্ত ইতিমধ্যে নিজের সংকল্প স্থির করে ফেলেছেন। এখন তার দিক থেকে কোনো মতেই আপত্তি উত্থাপন করা চলবে না!

বরঞ্চ—এই প্রস্তাবে তিনি যে অতিরিক্ত রকম উল্লসিত হয়ে উঠেছেন—, তাঁর কথায় ও হাবভাবে সেইটেই একান্তভাবে প্রকাশ করতে হবে।

প্রশান্ত মনে মনে আরো প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, মঙ্গল গ্রহের

বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে সকল দুরূহ তত্ত্ব জানতে হবে, বুঝতে হবে—আর অনুধাবন করতে হবে।

বিশেষ করে মঙ্গল গ্রহের আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটা শিক্ষার্থীরূপে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

ছেলেবেলায় প্রশান্ত তার ঠাকুমা-দিদিমাদের কাছে রূপকথা শুনেছে। রাক্ষসদের প্রাণ-ভোমরা লুকিয়ে রাখা হত সরোবরের নীচে স্ফটিকের স্তম্ভের ভেতর। যে রাজপুত্র এক ডুবে গিয়ে সেই স্ফটিকের স্তম্ভ ভেঙে রাক্ষসদের প্রাণ-ভোমরা করায়ত্ত করতে পারত—পাষানপুরার রাজকন্যাকে সেই লাভ করত।

আজ মানুষ-প্রশান্ত জানতে পেরেছে—মঙ্গল গ্রহের প্রাণ-ভোমরাই বলো, আর সঞ্জীবনী মন্ত্রই বলো—সেটা লুকিয়ে আছে তাদের আলোক-নিয়ন্ত্রণের খেলায়।

এই আলোক নিয়ন্ত্রণকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে একেবারে করায়ত্ত করতে হবে।

তা হলেই মারণ-উচাটন আর বশীকরণ সব কিছু তার নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চলে আসবে। প্রশান্ত অনুগত শিষ্যের মতো সেই আলোক-নিয়ন্ত্রণের সব কিছু রহস্য অনুধাবন করতে লাগল!

ইতিমধ্যে আরো একটি অবাক করা প্রস্তাব এলো প্রশান্তর কাছে। মিঃ ইন্‌ফিনিট জানালেন, প্রশান্ত ত এখন পৃথিবীতে বার্তা প্রেরণের সমস্ত কলা-কৌশল আয়ত্ত করেছেন। সুতরাং তাকে আরো একটি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

পৃথিবীর যে বন্ধু-বৈজ্ঞানিক তাঁকে সবচাইতে বেশী বিশ্বাস করে তার কাছে বার্তা প্রেরণ করতে হবে। প্রশান্ত জানাবেন, তিনি মঙ্গল গ্রহের উড়ন্ত চাকীতে চড়ে এই সুদূর মঙ্গল গ্রহে চলে এসেছেন। এখানে বিজ্ঞানের নব নব বিস্ময় তিনি অনুধাবন ও আয়ত্ত করেছেন। বিশেষ করে পৃথিবীর খাদ্য সমস্যার যাতে আশু সমাধান করা যায়—সেজন্য তিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে পৃথিবীর

উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে তিনি একটি আলোচনা সভা আহ্বান করতে চান। বৈজ্ঞানিক বন্ধুটি যেন তার পক্ষ থেকে পৃথিবীর এক নির্জন মানমন্দিরে এই সেমিনার আহ্বান করেন। প্রশান্ত বিশেষ একটি তারিখে উড়ন্ত চাকীতে চেপে সেখানে উপস্থিত হচ্ছেন। তারপর সাক্ষাৎমত সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সব কিছু আলোচনা হবে।

এই হচ্ছে মিঃ ইন্‌ফিনিটের প্রস্তাব।

তারপর মিঃ ইন্‌ফিনিট আসল কথাটা খুলে বললেন।

প্রশান্ত আগে আগে অভিযানে অগ্রসর হবেন। আর মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিক দল একটা দূরত্ব বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করবেন। শত শত উড়ন্ত চাকী তাদের সঙ্গে থাক্‌বে।

প্রশান্তর উড়ন্ত চাকীটি সকল রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আর আলোক-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সজ্জিত থাক্‌বে।

প্রথমে তিনি পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের অনুরোধ করবেন সকল রকমে তার সহযোগিতা করতে।

তাঁরা যদি প্রথমেই সম্মত হন তা হলে ত' কথাই নেই। কিন্তু পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক দল যদি প্রশান্তর প্রস্তাব সমর্থন না করেন—তা হলে প্রশান্ত আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় তাদের একটি অঞ্চলে নজর বন্দী করে রাখবেন। কিছুতেই তাদের মুক্তি দেবেন না।

ইতিমধ্যে মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিক দল শত শত উড়ন্ত চাকী নিয়ে পৃথিবীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

প্রথমে পৃথিবী অধিকার করতে হবে। তারপর সকলের ভালোর জন্যে সংগঠনমূলক কাজে হাত দিতে হবে।

মিঃ ইন্‌ফিনিট একথাও জানালেন যে, প্রথমে কিছুটা লোকক্ষয় হতে পারে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বৃহত্তর কল্যানের নিমিত্ত এই সামান্য লোকক্ষয় কিছুই নয়! মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিক দল যে পৃথিবীর আকৃতি ও প্রকৃতি একেবারে বদলে দেবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আর এই পরিবর্ত্তন—সকল দিক দিয়ে শুভকেই সূচিত করবে।

কথা প্রসঙ্গে মিঃ ইন্‌ফিনিট এ কথাও জানালেন—পৃথিবীর বুকেও ত' মাঝে মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ আর ধ্বংসলীলা দেখা গেছে। তারপর বার বার নতুন করে পৃথিবী গড়া হয়েছে। বিজ্ঞানের জয় যাত্রাই তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এবার যে পরিপূর্ণ পরিকল্পনা নিয়ে তারা পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তাতে একটি নতুন ঐশ্বর্যশালী জগৎ গড়ে উঠবে। সেখানে অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি থাকবে না। অগ্নিদাহের লেলিহান শিখা থাক্‌বে না। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাতের দুঃস্বপন থাক্‌বে না। সর্বোপরি খাদ্য সমস্যার একেবারে সমাধান হয়ে যাবে।

মানুষ আনন্দের সঙ্গে পরিশ্রম করতে আর কাজ করতে শিখবে। জীবনকে জয়যুক্ত করবার ব্রত তারা গ্রহণ করবে।

আরো একটি কথা মিঃ ইন্‌ফিনিট তাকে সগর্বে জানিয়ে দিলেন ঃ

মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিকেরা প্রশান্তকে পৃথিবীর দিকে রওনা করিয়ে দিয়ে, তাকে কিছুটা দূর অনুসরণ করে এসে—সেই মহাশূন্যে (Space) একটি ষ্টেশন নির্মাণ করবে। সেখানে তারা অপেক্ষা করতে থাক্‌বে। প্রশান্ত যদি তার অভিযানে জয়যুক্ত হয় আর পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের সম্মত করতে পারে তা হলে ত কথাই নেই। নইলে যুদ্ধ পৃথিবীর বুকে অকস্মাৎ নেমে আসতে পারে। অবশ্য প্রশান্তকে এ আশ্বাসও দেয়া হল যে সেই যুদ্ধ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হবে। আর তার পরই সুরু হবে পৃথিবীকে ঐশ্বর্যশালী এক বিজ্ঞান আশ্রিত অভিনব গ্রহ গঠন কার্যে।

প্রশান্ত মিঃ ইন্‌ফিনিটের প্রস্তাব নীরবে শুনে গেলেন। কোনো প্রতিবাদ তিনি করলেন না। অবশ্য তিনি যে এই প্রস্তাবে আন্তরিক খুশী হয়েছেন—আর সুদূর প্রসারী এই বিরাট পরিকল্পনায় পৃথিবীর আশু উন্নতি হবে—এই মনোভাব একটু পরে তিনি প্রকাশ করলেন।

শুনে মিঃ ইন্‌ফিনিটের মনে আর কোনো দ্বিধা রইল না। তি
ফুল্ল মনে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে চলে গেলেন।

সেইদিন গভীর রাত্রে প্রশান্তর চোখে আর ঘুম নেই। পৃথিবীকে
এই দুঃসময়ে কি করে বিপদ মুক্ত করা যায়—এখন তার সেই একমাত্র
ভাবনা।

পৃথিবীর সন্তান সে। জীবন পণ করেও এই পরম দুর্দিনে
চরম আঘাত হানবার চেষ্টা করবে। যদি অশক্ত হয় তাহলে নিজে
জীবন আহুতি দেবে।

হঠাৎ তার চোখের সামনে তার জন্মভূমি—তার জন্ম ভিটার
ভেসে উঠল। সেই শিবমন্দির—সেই কাকচক্ষু জলের পুষ্করী
সেই উঠোনে লুকিয়ে থাকা কামিনী ফুল আর শিউলী গাছ—

আবার এই জন্ম ভিটায় কি সে ফিরে যেতে পারবে?

পরদিন যথাসময়ে অপারেশন শুরু হল।

প্রশান্ত পৃথিবীর মানুষ। তাই সে সবার আগে বিশ্বাসঘাত
মতো পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিভীষণের দলও কখনো পৃথি
বুক থেকে লুপ্ত হবে না।

মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিক দল অর্ধপথে যখন মহাশূন্যে ষ্টেশন
করার কাজে ব্যস্ত,—সেই সময় প্রশান্ত তার উড়ন্ত চাকী
অকস্মাৎ ঘুরিয়ে নিলে। মুখোমুখি হল মঙ্গল গ্রহের উড়ন্ত চাকী
দিকে।

আলোক-নিয়ন্ত্রণের কক্ষ থেকে ধ্বংসের লাল আলো
মধ্যে মঙ্গল গ্রহের সবগুলি উড়ন্ত চাকীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভ
করে দিল।

কিন্তু মহাশূন্যের এই লেলিহান অগ্নিকাণ্ড হয়ত পৃথিবীর
দেখতে পেলে না।

ততক্ষণে প্রশান্তর উড়ন্ত চাকীটি দ্রুত গতিতে পৃথিবীর
ফিরে আসছে!

॥ সমাপ্ত ॥